বিমল দাশগুপ্ত

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রবেশিকা

বিমল দাশগুপ্ত

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৬৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৬

দাম : আড়াই টাকা মাত্র

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫এ ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

—লেখক এ দাবী করে না যে এই পুস্তকে শিক্ষা সম্বন্ধে, কোন দিক হইতেই, বিস্তারিত বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। বরঞ্চ সে স্বীকার করে যে এর অভাবই সর্বত্র লক্ষ্য করা যাইবে।

—এ পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বল্পমেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পাঠ্যতালিকা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে একটা মোটামুটি ধারনা দেওয়া মাত্র। শিক্ষণাধীন হইবার পূর্বে বা শিক্ষণাধীন থাকাকালীন এই পুস্তকপাঠে শিক্ষকগণ জ্ঞাতব্য সব বিষয়ের একটা ধারণা করিতে পারিবেন। —কোন পুস্তকেই শিক্ষণাধীন শিক্ষকের জ্ঞাতব্য সব কিছু পাওয়া যাইবে না। অধ্যাপনা পুস্তকের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করে এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞানের উপাদান হইবে—পুস্তক, অধ্যাপনা আর শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় লব্ধ অভিজ্ঞতা।

লেখকের স্বল্প আশা পূর্ণ হইলেই সে তাহার শ্রম সার্থক মনে করিবে।

লেখক এ পুস্তক রচনায় সাহায্যের জন্য তাহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'শিক্ষক-শিক্ষণ প্রবেশিকা'-র প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণও নিঃশেষ। যাঁদের দ্বারা এ পুস্তক সাদরে গৃহীত হয়েছে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পশ্চিমবংগে স্বল্পমেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা হয়নি। তাই, দ্বিতীয় সংস্করণে, এ পুস্তকের বহু অংশ বাদ দিয়ে, নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যসূচী অনুসারে এ পুস্তকের সংস্কার করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের উপযোগিতা স্বীকৃত হলে কৃতার্থ হব।

দ্বিতীয় সংস্করণ রচনায় শ্রীমৃতুঞ্জয় বক্সী মশাইয়ের কাছে ঋণের ভার আমার অনেক বেড়েছে।

—বাণীপুর—
শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৫।

বিমল দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

॥ শিক্ষা : শিক্ষার উদ্দেশ্য ॥

শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোন তত্ব বা আলোচনা অনুধাবনের জন্য শিক্ষা কী এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য কী সে বিষয়ে সম্যক আলোচনা দরকার।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকে মানুষের শিক্ষা সুরু। (মহাভারতে শোনা যায় যে অভিমন্যু মাতৃগর্ভে থাকতে চক্রব্যূহ ভেদ করতে শিখেছিলেন।) মৃত্যু পর্যন্ত সে শিক্ষা চলতে থাকে। সে শিক্ষা সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা দুই-ই হতে পারে। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যবহারে নানা পরিবর্তন হয়। তবে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষের ব্যবহারে যে পরিবর্তন হয় তাকে শিক্ষা বলা যায় না। অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের যে পরিবর্তন তাকেই শিক্ষা বলা হয়। অভিজ্ঞতাজনিত পরিবর্তনের মধ্যেও যে অংশ মন্দ বা সমাজবিরোধী তাকে শিক্ষা সংজ্ঞা দেওয়া হয় না।

তাই শিক্ষার একটা সাধারণ সংজ্ঞা হতে পারে **সুস্থ ও সফল সামাজিক জীবন যাপনের জন্য, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যবহারের পরিবর্তন সাধন**। কিন্তু এ সাধারণ সংজ্ঞা এত ব্যাপক যে এতে শিক্ষণাধীন শিক্ষক নিজের কাজের উদ্দেশ্য বা পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক কোন নির্দেশ পান না। এ সংজ্ঞার আওতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত, বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং পরিবার, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই সে সমস্তও পড়ে

শিক্ষার পূর্বোক্ত সংজ্ঞা যেমন অতি ব্যাপক তেমনি অতি সংকীর্ণ নানা সংজ্ঞাও প্রচলিত আছে।

অনেকে জ্ঞানার্জন করাকে বা আরও সহজ ভাবে, লেখাপড়া-শেখাকেই শিক্ষা মনে করেন। জ্ঞানার্জন বা লেখাপড়া শেখা শিক্ষা বা শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। জ্ঞান সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় দুই-ই হতে পারে। নিষ্ক্রিয় জ্ঞান ব্যক্তির ব্যবহারের পরিবর্তন সাধন করে না। কয়েক হাজার বছর আগে 'সত্য কথা বলা উচিত' 'চুরি করা উচিত নয়', 'সর্বজীবে সম দয়া', প্রভৃতি নীতি-হিসাবে মানব সমাজে প্রচলিত হয়েছে ; কিন্তু তথা কথিত জ্ঞানী বা লেখা-পড়া জানা কত লোক এ নীতিগুনোর প্রতি ঔদাসীন্যই জীবনের নীতি বলে গ্রহণ করেছেন।

কেউ কেউ মনে করেন চরিত্রগঠনই শিক্ষার লক্ষ্য।—চরিত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বা ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ ভাবে গঠিত হয়েছে কি না তা বিচার করা হয় কতগুনো সমাজ সম্মত আচরণ দিয়ে। কিন্তু বিভিন্ন সমাজে বা একই সমাজে বিভিন্ন কালে চারিত্রিক আদর্শের পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং, চরিত্রগঠনকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট করলে, লক্ষ্য অস্পষ্টই থেকে যায়।

প্রাচীন ভারতে ও ইউরোপে মধ্যযুগে কতগুনো নির্দিষ্ট কৌশল আয়ত্ত করা বা অভ্যাস গঠন শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হত। সে বিবেচনার মূলে বিশ্বাস ছিল সে নির্দিষ্ট কৌশলগুনো আয়ত্ত বা বাঞ্ছনায় অভ্যাসগুনো গঠিত হলে ব্যক্তির জীবন সুস্থ ও সুগঠিত হবে।— বলাবাহুল্য, এরকম ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না এবং এ শিক্ষা পদ্ধতিকে মানুষ গড়ার একটা ছাঁচ মাত্র বলা যায়ঃ আর সে ছাঁচ সমাজের বয়স্কদের বা

তাদের মধ্যে যারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী তাদের ভবিষ্যত সমাজ সম্পর্কিত আশা আকাংখা বা আদর্শের কাঠামোতে গড়া।

প্রকৃত প্রস্তাবে, জ্ঞানার্জন বা লেখাপড়া শেখা, অথবা বয়স্কদের প্রভাবে নির্দিষ্ট কৌশল আয়ত্ত করা বা অভ্যাস গঠন বা চরিত্রগঠনই শিক্ষা নয়। শিক্ষা আর জীবন বা শিক্ষালাভপদ্ধতি ও জীবনের বিকাশ অভিন্ন। মানুষ বাঁচতে-বাঁচতে শেখে, শিখতে-শিখতে বাঁচে। মানুষ বাঁচার জন্য এবং বাঁচতে-বাঁচতে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংগে সম্বন্ধ স্থাপন করে। এ সম্বন্ধে স্থাপনের মূলে থাকে জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ এবং সে তাগিদে মানুষ বদলায়, তার পরিবেশ বদলায়। এ সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই আমরা নানা কৌশল, জ্ঞান ও ভাষা শিখি। পরিবেশের সংগে আমাদের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। আমরা কখনও শিক্ষক, কখনও ছাত্র। শিক্ষার গতি দ্বি-মুখী ; শিক্ষা-ক্রিয়ায় দুই পক্ষ—কর্তা আর কর্ম।

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ—**মানুষ আর তার পরিবেশের পারস্পারিক সম্পর্কজনিত, জীবনের সর্বমুখী বিকাশের সহায়ক ব্যবহারিক পরিবর্তন।**

মানুষের পরিবেশ ও আদর্শ নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এ পরিবর্তন ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। মানুষ শিক্ষার দ্বারা মানসিক গতিশীলতা লাভ করে,—পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলতে শেখে। ব্যক্তি বা সমাজ এ গতিশীলতার গুণেই ক্রমশ উন্নতি বা সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়। এ গুণ জীবনের স্থায়িত্বের জন্য অত্যাবশ্যক। এ গুণের অভাবে বহু জীবশ্রেণী ও মনুষ্য সমাজ লুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের দুই দিক—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য মানুষের জীবনের এ দুই দিকেরই সুসমঞ্জস বিকাশ অত্যাবশ্যক। অতি আদিমকাল থেকে মানুষের শিক্ষার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে যুগে যুগে শিক্ষার গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে জীবনের এ দুই দিকের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। যে-কোন দেশ বা কালের শিক্ষাব্যবস্থাধীন শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশকে লক্ষ্য করেই শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্বাচিত হয়েছে।

* * *

জীবন আর শিক্ষা অভিন্ন বলে জীবনের উদ্দেশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্যকে প্রভাবান্বিত করে। জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণীত হয় জীবন দর্শন অনুসারে। তাই, শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবন দর্শনের উপর নির্ভরশীল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবনদর্শন **অধ্যাত্মবাদ**। অধ্যাত্মবাদের গোড়ার কথা ভগবানে বিশ্বাস। ভগবান নিজের ইচ্ছায়, নিজেরই কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্বসৃষ্টি করেছেন। তাঁরই উদ্দেশ্য-সাধন মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঃ তিনিই সমস্ত কর্ম ও চিন্তার কেন্দ্র ও লক্ষ্য ঃ তিনিই সমস্ত প্রেরনার উৎস ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনি নির্দিষ্ট প্রবণতা দিয়ে দেন। সে প্রবণতার সম্যক বিকাশ-সাধন দ্বারা স্রষ্টার অভিপ্রেত চরিত্রগঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

জড়বাদ আধুনিক জীবনদর্শন। চৈতন্যস্বরূপ ভগবান এ মতের ভিত্তি নয়। জড়বাদ অনুসারে জড়বস্তু ভিন্ন আর কিছু নেই—চৈতন্য

জড়েরই বিকার বা ধর্ম। মানুষ বিভিন্ন অণু-পরামাণুর সংমিশ্রনজাত এক আকস্মিক সৃষ্টি।

অধ্যাত্মবাদে ইহকাল থেকে পরকালের গুরুত্ব অনেক বেশী। জড়বাদে জীবনকালই গুরুত্বপূর্ণ—পরকাল, অতীন্দ্রিয় জীবন প্রভৃতি অলীক কল্পনা। এ জীবনকে সুখময় ও শুভময় করে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। জীবনকে সুখময় ও শুভময় করে তোলার জন্য যে জ্ঞান, দক্ষতা বা চারিত্রিকগুণ ব্যক্তির প্রয়োজন শিক্ষার সাহায্যে মানুষের সে জ্ঞান, দক্ষতা বা চরিত্রলাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

একক মানুষের ভাল মন্দ নিরর্থক—সমাজের ভালমন্দই মানুষের ভালমন্দ। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির পৃথক মন নেই—জীবন নেই। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তিজীবনের বিকাশ—পূর্ণতা! সুতরাং, শিক্ষা দ্বারা মানুষকে সমাজান্তর্গত সমগ্র জীবনের যোগ্য করে তুলতে হবে।

অধ্যাত্মবাদ আর জড়বাদ মিলিয়ে আমেরিকাতে এক জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে (একে জীবন দর্শন না বলে, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভংগী বলা যায়।)—এর গোড়ার কথা **অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা**। এ মত অনুসারে জীবনে কোন চরম লক্ষ্য বা সত্য নেই। জীবন এক গতিশীল প্রবাহ। শাশ্বত ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সুন্দর-অসুন্দর কিছু নেই। জীবনকে যা উন্নততর, সমৃদ্ধতর করে তাই ভাল, সৎ ও সুন্দর, আর যা তাতে বাধা সৃষ্টি করে তাই মন্দ, অসৎ ও অসুন্দর। জীবনের সব ভাল মন্দই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ—জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষারই ক্ষেত্র।

সর্বাধুনিক এ মতবাদ অনুসারে—শিক্ষার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য

বা আদর্শ নেই। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি যে সকল অভাব বা প্রয়োজন অনুভব করে সেগুলো মেটাবার শক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সে কারণে একই দেশে একই কালে বিভিন্ন ব্যক্তির শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন হতে পারে।

এ মতবাদ অনুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার বিস্তৃততর ক্ষেত্র সৃষ্টি করা ও শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রেরণা, প্রবণতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করা। এ মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তা থেকে হাতের কাজের উপর অধিক জোর দেয়—কাজের মাধ্যমে শেখা এ মতবাদের এক বিশেষ নীতি।

বুনিয়াদী শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি বহুল পরিমাণে এ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

* * *

শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশে-দেশে, কালে-কালে বদলে যায়—এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদ শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে। বিদ্যাকে দুইভাগ করা হয়ঃ (১) পরাবিদ্যা—অধ্যাত্ম জ্ঞানঃ (২) অপরা বিদ্যা—জড় জ্ঞান।

সংসার-সমাজে বেঁচে থাকার জন্য প্রাসংগিকভাবে অপরা বিদ্যা বা জড়জ্ঞান দেওয়া হত। অধ্যাত্মজ্ঞান লাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। ব্রহ্মচর্যপালন, গুরুসেবা, আবৃত্তি, উপাসনা প্রভৃতি পরা বিদ্যা লাভের পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

প্রাচীন গ্রীস দেশের দুই প্রধান রাজ্য এথেন্স ও স্পার্টায় দুই পৃথক আদর্শ ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থার উপর অধ্যাত্মবাদী জীবনদর্শনের প্রভাব ছিল। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রাচীন এথেন্সের বিখ্যাত শিক্ষাগুরু। পরমাত্মার কথা স্পষ্ট উল্লেখিত না হলেও, এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থায় অতীন্দ্রিয় গুণাবলীতে বিশ্বাস প্রকাশ পায়। এ অতীন্দ্রিয় গুণাবলীর উপলব্ধি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি ছিল শিক্ষার আদর্শ।

সমাজজীবন থেকে ব্যক্তিগত জীবনের উপর এথেন্সের শিক্ষায় অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। সাহিত্য, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল না। নাগরিকগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করত।

স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থায় জড়বাদের প্রভাব দেখা যায়। পরলোক থেকে ইহলোক এ ব্যবস্থায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনের যোগ্যতার চেয়ে রাষ্ট্রজীবনের যোগ্যতালাভে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। সৈন্যবলের উপর রাষ্ট্রের শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল বলে সব শিশুকে সৈন্যবৃত্তি শিখতে হত। তাই, দৈহিক পংগুতা বা শক্তিহীনতা অবাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হত। পংগু বা দৈহিক শক্তিহীন শিশুকে হত্যা করা হত। সাহিত্য, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতির সমাদর ছিল না।

পরবর্তী যুগে রোমানগণ এথেন্সে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং রোমে অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়। রোম এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সে সাম্রাজ্য পরিচালনে যোগ্য অংশগ্রহণে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনে রোমান নাগরিকদের শিক্ষায় আইন ও রাজনীতি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অধ্যাত্মবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু, প্রাচীন ভারতবর্ষ বা এথেন্স মানুষের যেটুকু অধ্যাত্মশক্তি আছে বলে বিশ্বাস করেছিল মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সেটুকুও স্বীকৃত হয় নি। মধ্যযুগের অধ্যাত্মবাদ অনুসারে মানুষ পাপে ডুবে আছে—পরমাত্মার উপলব্ধি তার পক্ষে অসম্ভব। তাই, এ যুগের শিক্ষাপদ্ধতিতে দেখতে পাওয়া যায় ধর্মশাস্ত্র পাঠ, আত্মনিগ্রহ, অনুতাপ আর প্রার্থনা।

মধ্যযুগের অন্ধকার কেটে গিয়ে ইউরোপে নবযুগের সূচনা হলে মূলতঃ আদর্শবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রচলিত হল। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের মানসিক তথা অধ্যাত্ম উন্নতির সোপান ও উপায় স্বরূপ কয়েকটি মানসিক বৃত্তির সম্যক বিকাশ বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকৃত হল। এ স্বীকৃতির পূর্বে মানুষের মনকে বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং অনুমান করা হয়েছিল যে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠে এ সকল বৃত্তির সম্যক বিকাশ সম্ভব। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার সংগে জীবনের যোগ রইল না—সমাজ-জীবন ভরে গেল কৃত্রিমতায়।

এ কৃত্রিম শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী চিন্তাবীর রুশোর লেখনীমুখে। তাঁর মতে এ কুশিক্ষা থেকে অশিক্ষা ভাল ; শিশু স্বাভাবিক ভাবে শিখবে—তার স্বতঃস্ফূর্তি বজায় থাকবে।

তিনি ছাত্রজীবনকে চার ভাগে ভাগ করেন : ৫ বছর থেকে ৭ বছর—শৈশব : (২) ৭ বছর থেকে ১২ বছর—বাল্য : (৩) ১২ বছর থেকে ১৪ বছর—কৈশোর এবং : (৪) ১৪ বছরের পর

বয়ঃসন্ধিকাল। তার মতে শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা তার দেহ-মনের স্বাভাবিক বাড়তির নিয়ম মেনে চলবে। ৫ বছর থেকে ১২ বছর কাল পর্যন্ত শিশুর কোন পাঠ্য পুস্তক থাকবে না—প্রকৃতির সাহচর্যে তার ইন্দ্রিয়শক্তি বিকাশ লাভ করবে এবং জীবনের এ ক'বছরের অপ্রত্যক্ষ শিক্ষাই ভিত্তি হবে শিশুর ভবিষ্যত জীবনের শিক্ষার।

শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, শিক্ষকের পর্যবেক্ষক ও পরামর্শ দাতার অংশ গ্রহণ, খেলাধূলা ও প্রয়োজনীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষা—প্রভৃতি নীতিও রুশোর কল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত।

শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর ইংগিত পরবর্তী শিক্ষাবিদ্‌গণ গ্রহণ করেন। শিশুর বয়স অনুসারে শিক্ষা, শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা, শিক্ষকের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে রুশোর ইংগিত পেষ্টালট্‌সি ও ফ্রবেল গ্রহণ করেন। মণ্টেসরি-শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

রুশোর মতবাদের ফলে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের ঔৎসুক্য জাগে ঃ সে জিজ্ঞাসার ফলে জড়বিজ্ঞানের উন্নতি হয় এবং সে উন্নতির ফলে শিক্ষায় জড়বাদ অধিক প্রভাবশীল হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব ও উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের ফলে এক নূতন যুগের সূচনা হয়—গণতন্ত্রের যুগ। সে যুগে মানুষে মানুষে ব্যবধান কমে—সমাজে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়ে। মানুষের উপলব্ধি হয় যে ব্যক্তিগত গুণ বা যোগ্যতার মূল্য অতি সামান্য—সামাজিক পরিবেশেই ব্যক্তির গুণাবলীর বিকাশ সম্ভব।

আধুনিক সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শনের মূল নীতি এই যে শিশু দেহমনে অনাবৃত অবস্থায় জন্মায়, সমাজ তার দেহ-মনের আবরণ

জোগায়। শিশু তার ভাব, আবেগ, অনুভূতি সমাজ থেকে গ্রহণ করে ঃ তাই বিভিন্ন সমাজের শিশুর প্রকৃতি বিভিন্ন। শিশুকে তার সমাজের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে দেওয়াই তার শিক্ষা। সমাজ জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু সমূহই শিক্ষণীয় বিষয় হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে এক বিশেষ সমাজ গড়ে উঠবে—সে সমাজের নানা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শিশু বাইরের বৃহত্তর সমাজ জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে। বিদ্যালয়ের সমাজের সংগে বাস্তব সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকবে।

ভারতের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় এ শিক্ষা দর্শন স্বীকৃত ও অবলম্বিত হয়েছে।

* * *

অধ্যাত্মবাদী ও আদর্শবাদী জীবন দর্শন থেকে শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আসে। অতি প্রচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান। সর্বাধুনিক শিক্ষায় সমাজতন্ত্রবাদ শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করেছে। শিক্ষায় শিক্ষার্থীর পরিবেশের উপর বাঞ্ছনীয় জোর দেওয়া হয়েছে ঃ সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। সমাজের যোগ্য সভ্যরূপে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য।

ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত Syllabus for Emergency Teachers Training under the Five Year Plan—নামক

[শেষাংশ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

॥ বিদ্যালয় ঃ সমাজ ঃ গণতান্ত্রিক শিক্ষা ॥

জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে মানুষ তার পরিবেশের সংগে লেন-দেনের সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রয়োজন মেটাবার প্রচেষ্টা একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে এবং সে-প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেমন, ধর্মপিপাসার নিবৃত্তি ও পূজা-অর্চনার জন্য দেবমন্দির গড়ে ওঠে।

এ ভাবেই শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যালয়ের উদ্ভব। তবে সমাজের আদিম অবস্থায় প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না—বিদ্যালয়ও ছিল না। জৈবস্তরের আদিম মানুষের শিক্ষা জীবন-ধারণের কৌশল আয়ত্ত করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজে অর্থকরী নানা বৃত্তি প্রচলিত হবার পরও জ্যেষ্ঠের কাছ থেকে কনিষ্ঠের পারিবারিক বৃত্তি শিক্ষাতেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। সামাজিক জীবনের শিক্ষা ব্যক্তি পরস্পরকে দেখে ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লাভ করত।

সমাজের জ্ঞানের সঞ্চয় বেড়ে চলল—লিখিত ভাষার সৃষ্টি

[১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পুস্তিকার চতুর্থ পৃষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে লেখা আছে ঃ
"Broadly Speaking, primary education may be interpreted to centre round the following four objectives :—

I. Cleanliness—Personal and Community.
II. Training in self expression—oral and manual.
III. Literacy and general Knowledge.
IV. Individual and social development.

হল—সমাজস্থ মানুষে-মানুষে সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠল। তখন নানা জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল। তবে সে-সব প্রতিষ্ঠান আজকার বিদ্যালয় নয়—সে-সব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গুরু-শিষ্যের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও সম্বন্ধ। (এ রকম ব্যবস্থা আজও আমাদের দেশের টোলের শিক্ষায় দেখা যায়।) দেশের রাজা বা ধনী পণ্ডিতকে পোষণ করতেন—শিষ্য গুরুগৃহে গুরুর পরিবারভুক্ত হয়ে নির্দিষ্টকাল শিক্ষা গ্রহণ করত। এ রকম প্রতিষ্ঠানের কোন স্থায়িত্ব ছিল না—গুরুর মৃত্যু, অনিচ্ছা বা স্থানান্তর গমনে প্রতিষ্ঠান লোপ পেয়ে যেতে পারত।

ইউরোপে রোমান সভ্যতার যুগে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইউরোপে মধ্যযুগে বিদ্যালয় গির্জাসংলগ্ন থাকত—যেমন আমাদের দেশের মন্দির সংলগ্ন চতুষ্পাঠী। মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার নূতন নূতন জ্ঞানের সঞ্চয়ে প্রবালদ্বীপের মত বেড়ে চলল আর কালক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত।

কালক্রমে জীবনের প্রয়োজন বিচিত্রতর হল—শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হতে লাগল। আদিযুগের প্রধান শিক্ষণীয় ছিল ধর্ম আর ধর্মীয় কৃষ্টি। তৎপরবর্তী যুগে চরিত্র গঠন শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রধানতম হল। ক্রমে ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয় সমূহ পাঠ্যসূচীতে স্থান লাভ করে।

আদিকালে আপামর জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের উদ্ভবের সংগে সংগে সকল নাগরিকের শিক্ষার

অধিকার এল। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুতি।

* * *

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে শিক্ষার অর্থ, আদর্শ উদ্দেশ্য ও উপায় প্রভৃতি সমাজের সমকালীন অবস্থা ও আদর্শদ্বারা স্থিরীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সমাজের যোগ্য নাগরিক করে তোলা। সুতরাং, শিক্ষক সমাজের আজ্ঞাবহ সেবকমাত্র এবং বিদ্যালয় সমাজেরই অন্তর্গত এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিষ্ঠান মাত্র।

এ নীতি সত্য হলেও, একান্তভাবে এ নীতি স্বীকার করে নিলে শিক্ষা ও শিক্ষককে ছোট করা হয়। সমাজের উপর শিক্ষা শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রভাব অস্বীকৃত হয়।—সমাজ ভাবী বংশধরদের ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক শুধু সমকালীন আশা-আকাংখা বা আদর্শের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সমাজের চিরস্থায়ী প্রয়োজনের আদর্শ ও মংগল সামনে রেখে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তার ফলে, সাময়িক আদর্শ তার যোগ্য সম্মান পেলেও, শাশ্বত আদর্শই বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হয়—বিশেষ যুগের দোষ-ত্রুটি স্থায়ী হয় না—সমাজ ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।

শিক্ষা ও সমাজ পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে।

বৃহত্তর সমাজের স্বাধীন পরিবেশে শিশুকে ভবিষ্যতের আদর্শ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলা সহজ বা সম্ভব নয়। তাই. সমাজের মধ্যেই বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষা তথা ভবিষ্যত জীবনের

প্রস্তুতির জন্য এক বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এ ভাবে দেখলে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ কৃত্রিম ও সংকীর্ণ। তাই, কার্য্যত বিদ্যালয়কে বৃহত্তর বাস্তব সমাজের অনুরূপ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয়। অন্যথায়, শিক্ষায় কৃত্রিমতা আসে, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয়ে সমাজান্তর্গত এক ক্ষুদ্র সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সেখানকার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান উদ্দেশ্যমূলক হবে—প্রত্যেক অনুষ্ঠান দ্বারাই শিক্ষার্থী কোন না কোন বাঞ্ছিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করবে অথবা প্রয়োজনীয় কোন ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হবে।

তবে এ বিষয়ে শিক্ষককে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও প্রধান হয়ে উঠলে অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও আনন্দ থাকবে না। সমস্ত শিক্ষা-প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও আনন্দ না থাকলে প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবে।

* * * *

বর্তমান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক জীবনই আদর্শ সাজাজিক জীবন বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানবশিশু তার শিক্ষা মারফত এ গণতান্ত্রিক জীবন যাপনে প্রস্তুত ও অভ্যস্ত হবে।

গণতন্ত্রের মূলনীতি ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের সামঞ্জস্যবিধান, ব্যক্তির ইচ্ছা সমষ্টির ইচ্ছার অধীন করা, সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা করা, সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তির নিজেকে নিরলসভাবে নিয়োগ করা।

পুঁথির মারফত এ শিক্ষা হয় না—অভ্যাসের দ্বারা এ শিক্ষা আয়ত্ত করতে হয়।

এ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক জাতি-ধর্ম, বিদ্যা-বুদ্ধি নির্বিশেষে সমদর্শী হবেন। পাঠদান প্রণালী, খেলাধূলা, উৎসব অনুষ্ঠানাদি এমনভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সকলে সমান অংশ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা পায় এবং পুরস্কার তিরস্কারের সমান অংশভাগী হয়।

ছাত্রদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি প্রতিষ্ঠানগতভাবে আনুগত্য জন্মাতে হবে। তারা যেন বিদ্যালয়ের গৌরবে আনন্দিত ও অগৌরবে দুঃখিত বোধ করে এবং বিদ্যালয়ের গৌরববৃদ্ধি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাদের দায়িত্ব বলে বোধ করে।

কিতাবী জ্ঞানলাভই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় ও অগ্রগতির মাননির্ণয়ের জন্য বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি পরিমাপক পরীক্ষা প্রচলিত থাকে তবে শিক্ষার্থীর মনে গণতন্ত্রের আদর্শ বদ্ধমূল করা কঠিন হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও প্রতিভা আবিস্কারের জন্য কিতাবী জ্ঞান লাভের সংগে সংগে হাতের নানা কাজ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রবর্তন আবশ্যক।

মোট কথা, বিদ্যালয় পরিচালনা এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনে "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—এরকম কোন ভ্রান্ত আদর্শ না জন্মে। সে যেন "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এ আদর্শ শেখে।

* * * *

বিদ্যালয়ের প্রতি প্রতিষ্ঠাগতভাবে আনুগত্যবোধ ও বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক জীবন সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য একই রকম পোষাক, বিদ্যালয়ের নিজস্ব সংগীত, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন

কৃতী ছাত্রদের পরিচয়, তাঁদের সংগে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ প্রভৃতি সহায়ক।

বিদ্যালয়ে এমন কতগুলো অনুষ্ঠান প্রবর্তন আবশ্যক যাতে প্রতি শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র ও বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র একযোগে কাজ করতে পারে। এ রকম সহযোগ পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত, "Co-curricular" ও "Extra-curricular" সমস্ত প্রকার কার্যেই সম্ভব।

বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা, কর্মসূচী ইত্যাদি ছাত্র-শিক্ষকের আলোচনাতে ও সম্মতির ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত। ছাত্রদের উপর বিদ্যালয়ের নানা কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে। এ দায়িত্ব বন্টিত হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে দায়িত্ব পুনর্বন্টিত হবে! নায়ক বা মন্ত্রী বদল হবে। এর ফলে আদেশ করতে ও মানতে ছাত্রেরা শিখবে। ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দিলে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ছাত্রেরা নানা সামাজিক গুণ লাভ করবে এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্রিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে।

মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে সভা, উৎসব, অভিনয়, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ সকল উপলক্ষ্যে সমস্ত ছাত্রেরা একযোগে কাজ করবে। এ সকল অনুষ্ঠানে অভিভাবক-অভিভাবিকা বা স্থানীয় অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করলে বিদ্যালয়ের সংগে বৃহত্তর সমাজের বাঞ্ছনীয় সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন মায়ফত ছাত্রদের সামাজিক শিক্ষা হতে পারে।

* * * *

বলা বাহুল্য, শিক্ষার বাঞ্ছনীয় ফললাভ করতে শিক্ষকের বাঞ্ছনীয় ব্যক্তিত্ব অত্যাবশ্যক। বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব সর্বাধিক প্রভাবসম্পন্ন।

শিক্ষককে সর্বদা নিরলসমন হতে হবে। তিনি নিয়ত পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা করবেন এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান গ্রহণ করবেন। কখনই তিনি মনে করবেন না যে তাঁর শিক্ষা শেষ হয়েছে—সব জ্ঞাতব্য জানা হয়ে গেছে। স্বীয় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে তিনি নিত্য জ্ঞান আহরণ করবেন।

"A good teacher is constantly learning and unlearning, observing and experimenting, and does not think that he has mastered his job and learned all there is to learn once for all."—পৃ: ৭ Syllabus for Emergency Teachers Training under the Five Year Plan.

শিক্ষক নিজের চেষ্টায় সর্বাধুনিক জ্ঞান আহরণ না করলে ক্রমশ অযোগ্য হয়ে পড়বেন। কারণ, বিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা অনুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদানপদ্ধতি ইত্যাদি বদলায়।

আগেই বলা হয়েছে যে আধুনিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র—যেখানে একজন আদেশ করে আর সকলে তা পালন করে—বিদ্যালয়ে অচল। তাই, শিক্ষককে শুধু শিক্ষণবিষয়ে জ্ঞানলাভ করলে চলবে না, গণতান্ত্রিক জীবনযাপনেও তাঁকে অভ্যস্ত হতে হবে।

"If our schools are to function as little 'democracies' and not as 'kingdoms' where one rules and the others obey, the teacher must not only be trained to teach, but also live democratically."—পৃঃ১৪

Syllabus for Emergency Teachers Training under the Five Year Plan.

॥ আধুনিক শিশু শিক্ষা ॥

শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া সাম্প্রতিক। এককালে শিশুকে পাত্রমাত্র মনে করা হত। বয়োজ্যেষ্ঠেরা তাদের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞানদানকেই (বা কতিপয় বাঞ্ছনীয় অভ্যাস গঠনকেই) শিশুর শিক্ষা মনে করতেন। শিশুর স্বাধীন সত্বা, প্রবৃত্তি, শক্তি, অনুরাগ-বিরাগ বিবেচনা করা হতনা।

শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক। শিশুকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান বা তার বাঞ্ছনীয় অভ্যাস গঠনে পীড়নেরও স্থান ছিল। "তাড়য়েৎ দশবর্ষানি" বা "Spare the rod and spoil the child" ইত্যাদি শিশু-শিক্ষণনীতি তাই প্রমান করে।—সৌভাগ্যক্রমে মানব শিশুর সে দুর্ভাগ্য শেষ হয়েছে।

আধুনিক শিশুশিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। আধুনিক শিশুশিক্ষার গোড়ার কথাই শিশুর স্বাধীনতা। শিশু তাহার দেহ-মনের বিকাশ ও অনুরাগ-বিরাগ অনুসারে শিক্ষা লাভ করে। শিশুর স্বাধীনতা স্বীকৃতির সংগে সংগে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের গুণ ও পরিমাণগত পরিবর্তন, পাঠদান পদ্ধতির ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার নানা সংস্কার সাধিত হয়েছে।

আধুনিক এক শিশুশিক্ষাব্যবস্থার নাম Kindergarten—শিশুউদ্যান।—শিশুরা যেন গাছের চারা—আপনাদের প্রাণধর্মে বেড়ে উঠবে, ফুলফলে সমৃদ্ধ হবে। শিক্ষক সে-বাগানের মালী—গাছের চারার যত্ন নেবেন—তার পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করবেন। এ

রূপকের অন্তর্নিহিত নীতি ও বিশ্বাস এই যে শিশু প্রাকৃতিক নিয়মে তার নিজস্ব গুণাবলীর বিকাশ সাধন করবে; শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়কারী মাত্র।

আগে শিক্ষাকে মনে করা হত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রস্তুতি। জীবনকে দুভাগ করে দেখা হত—একটা প্রস্তুতি আর অপরটা সত্যিকার জীবন। আজকার প্রতীতি এই যে শিক্ষাই জীবন। শিশুর জীবনই তার শিক্ষার ভিত্তি। শৈশবে শিশুর জন্য এক সুন্দর জীবনের পরিবেশ রচনা করতে হবে। সে জীবনে সে কাজ করবে, খেলবে, শিখবে স্বাভাবিক আনন্দে। সে চিন্তা করবে, নিষ্ঠার সংগে কাজ করবে, বুদ্ধি আর কর্মশক্তি প্রয়োগে তার জীবনের নানা সমস্যা সমাধান করবে। এভাবে সে তার সমগ্র জীবনপথে নিজেকে বিকশিত করতে করতে চলবে কর্মে, জ্ঞানে আর হৃদয়বৃত্তিতে—সমস্ত জীবনটাই হবে শিক্ষাময়। জীবন-যাপনের মাধ্যমেই সে ভবিষ্যত পূর্ণতর জীবনে জন্য প্রস্তুতি লাভ করবে।—এ নীতির অনুসরণেই আধুনিক শিশুশিক্ষা জীবনকেন্দ্রিক।

আত্মপ্রকাশের ক্ষমতালাভ শিক্ষার অন্যতম বা প্রধানতম উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, সকলের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম এক হতে পারে না। তাই, আজ শিশুর পাঠ্যসূচী সম্প্রসারিত হয়েছে। নৃত্য, গীত, অংকন প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে। আজকার সর্বজনাধিগম্য শিক্ষাব্যবস্থায় সকলেই যার যার স্বকীয়ত্ব অনুসারে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পাবে এবং নিজ নিজ প্রতিভা অনুসারে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে। আত্মপ্রকাশের পথ শিক্ষায় অবারিত না হলে প্রতিভার অপচয় ও সমাজের ক্ষতি হয়।

সংগীত ও চিত্রকলা শিশুর ভাবজীবন বিকাশের বিশেষ সহায়ক।

আগে জ্ঞানলাভপ্রচেষ্টায় শিশুর কোন সক্রিয় অংশ ছিলনা—সে থাকত নির্বাক, নিষ্কর্মা শ্রোতা বা দ্রষ্টা। শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে বা বোর্ড-এ লেখা দেখে সে শিখত। বর্তমান শিশুশিক্ষায় "Talk and chalk"—পদ্ধতির স্থান নেই।

শিশু স্বভাবত চঞ্চল—খেলাধূলা উপলক্ষে সে নানা ক্রিয়ানুষ্ঠান করে। পারিবারিক পরিবেশ ও অবস্থা অনুসারে সে নানা উদ্দেশ্যমূলক কাজও করে থাকে। খেলা উপলক্ষে শিশু ভাঙ্গা-গড়া প্রভৃতি যে সব ক্রিয়ানুষ্ঠান করে বা পারিবারিক বৃত্তি বা অভ্যাস অনুসারে যে সকল কাজে সে অভ্যস্ত, সে সমস্ত কাজে সে স্বাধীনতা ও আনন্দ উপভোগ করে।—সে সকল কাজের সাহায্যে বা মাধ্যমে আধুনিক শিশুশিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকে নানা বিষয়ে জ্ঞানদান করা হয়। কোথায় কী কাজ কতখানি উপকারে আসতে পারে শিক্ষক তা উদ্ভাবন করেন।

শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা ও ক্রীড়াচাঞ্চল্য শিশুশিক্ষার কাজে আজ বিশেষভাবে লাগান হচ্ছে। তাই, নাটক-অভিনয় ইত্যাদি আজ শিশুশিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

শিশুর ক্রিয়া দুরকম হতে পারে—একক ও দলবদ্ধ। আজকার শিশু শিক্ষায় শিশুর দুরকম ক্রিয়ারই যথেষ্ট সুযোগ গ্রহণ করা হয়। দলবদ্ধ ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু দশে-মিলে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। এ অভ্যাস মানুষের সারা জীবনই প্রয়োজন। এতে আদেশ বা নির্দেশ পালনের অভ্যাস হয় ও স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি দোষ হ্রাস পায় এবং সংঘবোধ জন্মে।

আধুনিক শিশু শিক্ষায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অহেতুক নিয়ন্ত্রণে শিশুর ব্যক্তিত্ব পংগু হয় না এবং স্বার্থপর ও সমাজ কল্যাণপরিপন্থী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয় না। বিদ্যালয়-সমাজে ছাত্র-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্র ও শিক্ষক-শিক্ষক—এ তিন প্রকার সম্বন্ধই গণতান্ত্রিক হওয়া দরকার।

আধুনিক শিশু শিক্ষায় হাতের কাজের যথেষ্ট গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক কোন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিশুকে নানা শিক্ষণীয় বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে জ্ঞানদান সম্ভব। তা ছাড়া, শিল্প অভ্যাস থেকে সংযম, মনঃসংযোগ, একাগ্রতা শ্রমের মর্য্যাদাবোধ, পৈশিক নিপুণতা প্রভৃতি নানা গুণ লাভ করা সম্ভব। শিল্প অভ্যাসের একটা অর্থ নৈতিক দিকও আছে।

শিশুর প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ শিশুর জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র। শিশুর শিক্ষায় এ দুই প্রকার পরিবেশ পর্য্যবেক্ষণ ও তাদের সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান যথাক্রমে শিশুর শিক্ষার উপায় ও ভিত্তিহিসাবে ব্যবহৃত হয়।

॥ পাঠ্যক্রম ॥

অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে পাঠ্যক্রম বলতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন্ জ্ঞান কতখানি অর্জন করতে ছাত্রকে সাহায্য করা যেতে পারে তার পূর্ব পরিকল্পনা বুঝায়। কিন্তু পূর্ণাংগ পাঠ্যক্রমে ছাত্রগণ কী জ্ঞানার্জন ও নৈপুণ্যলাভ করবে এবং সে-জ্ঞান ও নৈপুণ্যলাভ মারফত ছাত্রদের কী দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধন হবে, ছাত্রগণ কী কী কাজ করবে, শিক্ষক কী কী কাজ করবেন ও কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন—এ সমস্ত বিষয়ের পরিকল্পনা থাকবে।

পূর্ণাংগ পাঠ্যক্রম হবে বিদ্যালয়ের দিনপঞ্জী স্বরূপ। ঐ দিন-পঞ্জীতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কার্য্যাবলী ছাড়া শিক্ষা বা বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য যে সমস্ত কাজের ব্যবস্থা থাকা বিদ্যালয়ে বাঞ্ছনীয় সে-সমস্ত কাজের পরিকল্পনাও সন্নিবেশিত হবে।

পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যবিষয়, তার ক্রম, পাঠনদান পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পনা যত ব্যাপক হয় তত ভাল। তবে, পাঠ্যক্রম অবশ্যই পরিবর্তনশীল বলে বিবেচিত হবে। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রম শিশুর মননশীলতা ও ধীশক্তিকে অনুসরণ করবে—শিশু পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করবে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ব্যক্তিগতভাবে একটি শিশু বা একদলশিশু অপর এক শিশু বা অপর একদল শিশু থেকে আলাদা। তাই, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর ছাত্রদেরও বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন হতে পারে।

পাঠ্যক্রম ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। কোন

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার এবং পাঠ্যক্রমে ছাত্র-শিক্ষক উভয় পক্ষেরই কাজের পরিকল্পনা থাকে।

* * *

পূর্বকালে শিশুর পাঠ্যক্রম বিষয়-কেন্দ্রিক ছিল। জ্ঞানকে সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করা হত। বিষয়-বিভাগে বিষয়বস্তুর পার্থক্য ও ঐ বিষয়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভের পদ্ধতির বিভিন্নতার কথা বিবেচনা করা হত। এ ভাবেই পরা বিদ্যা (Divinities), অপরা বিদ্যা বা মানব বিজ্ঞান (Humanities) বা প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়বিভাগ করা হয়েছিল।

কর্মকেন্দ্রিক শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পর বিষয় কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের অবান্তরতা ও অসারতা ধরা পড়েছে। মানুষ যে-ভাবে জ্ঞানলাভ করে তা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে তার জ্ঞানকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

যুগে যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও অর্থ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমন পাঠ্যক্রমেরও পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক শিশু শিক্ষার পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য এই যে শিশু স্বাধীনভাবে, সানন্দে, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ ও কর্মের সাহায্যে তার জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করবে এবং সে-জ্ঞান তার ভবিষ্যত সামাজিক জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। পাঠ্যক্রমে শিশুর জ্ঞান সঞ্চয় ও দক্ষতা অর্জনের স্থান থাকবে, কারণ, কর্মদক্ষতা ভিন্ন কেবল জ্ঞান নিরর্থক।

আধুনিক শিশু শিক্ষায় পাঠ্যক্রম বিষয়-কেন্দ্রিক না হয়ে কর্ম কেন্দ্রিক হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিষয় পাঠের নির্দেশ থাকে না,

শিশুর দেহ-মনের প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে বিভিন্ন কর্মের ইংগিত থাকে। আধুনিক পাঠ্যক্রম কর্ম-কেন্দ্রিক এবং এতে বিষয়-বিভাগ নেই। একই কর্মের মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন বিষয় জ্ঞানলাভ করে ও বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে ঃ যেমন, বাগানের কাজের মাধ্যমে মাতৃ-ভাষা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি পরিচয়, বিজ্ঞান, শরীর চর্চা।

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে নানা কাজ এবং কতগুলো সামাজিক উৎসব শিক্ষার মাধ্যম ও উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। পাঠ্যক্রমে সে সকলের উল্লেখ থাকে।

ছাত্র ও শিক্ষক মিলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি কাজের পরিকল্পনা রচিত হয়। পরিকল্পনা যত সুস্পষ্ট হবে তা তত কার্য-করী হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা কর্মীর অত্যাবশ্যক শিক্ষা। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বয়সের গুণে শিক্ষক স্বভাবতই পরিকল্পনা রচনায় নেতৃত্ব করবেন। তবে, তাঁর নেতৃত্ব স্বেচ্ছাচারী না হয়ে গণতান্ত্রিক হবে।

॥ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ॥

বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুদের চিত্তাকর্ষক ও স্বাস্থ্যপ্রদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই, বিদ্যালয় ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে না হয়ে ফাঁকা জায়গায় হওয়া ভাল। লোকালয়ের নিকটে অথচ লোকালয়ের কোলাহল পৌঁছায় না এমন উঁচু, শুক্নো জায়গা বিদ্যালয়ের জন্য বাছাই করা ভাল। হাট-বাজার, ষ্টেশন, আপীস বা বহুলোক চলাচলের রাস্তা থেকে বিদ্যালয় কিছুদূরে হবে। বিদ্যালয়ের সন্নিকটে জলাশয় ও গাছপালা থাকলে পরিবেশ স্নিগ্ধ-সুন্দর হয়।

রুশো থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক মনীষী ঐ প্রকৃতির সান্নিধ্যকে শিশু মনের বিকাশের সহায়ক মনে করেছেন। প্রকৃতির সান্নিধ্য শিশু মনকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে আকৃষ্ট করে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ আধুনিক শিক্ষার এক অংগ।

বিদ্যালয়-গৃহে আলো-বাতাস থাকবে। আমাদের দেশে পূব-দক্ষিণে খোলা থাকলে ঘরে প্রচুর অলো-বাতাস পাওয়া যায়। বিদ্যালয় গৃহে যতটি শ্রেণী ততটি কক্ষ থাকবে; তদুপরি শিক্ষকদের বসবার ঘর ও একটা হল-ঘর অত্যাবশ্যক। শিক্ষকদের বসবার ঘরই আপীস হিসাবে ও শিক্ষোপকরণ ইত্যাদি রাখার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। হল-ঘরে সভা-সমিতি, উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হবে,—ছাত্রদের হাতের কাজ ইত্যাদি রক্ষিত হবে,—প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। উপযুক্ত পরিবেশ থাকলে এবং আবহাওয়া অনুকূল থাকলে সভা-সমিতি ও উৎসবাদি বাইরে হতে পারে। তবু, বর্ষা-শীতে ঘর প্রয়োজন।

শ্রেণী কক্ষের আয়তন শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে হবে। সাধারণতঃ এক শ্রেণীতে ত্রিশজনের অধিক ছাত্রের পাঠদান ও গ্রহণ অসুবিধাজনক। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রের জন্য অন্তত বার বর্গফুট্ জায়গা থাকা দরকার।

শ্রেণী কক্ষের ও বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের সংখ্যা ছাত্র ও শিক্ষক-সংখ্যার উপর নির্ভর করবে। আসন, ডেস্ক ইত্যাদির আকার ও উচ্চতা ছাত্রের উচ্চতা অনুসারে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর আসবাবপত্র বিভিন্ন ধরণের বা বিভিন্ন আকার ও উচ্চতার হতে পারে।

বিদ্যালয়ে খেলাধূলার স্থান ও ব্যবস্থা থাকবে। মলমূত্র ত্যাগের ও পানীয় জলের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে অত্যাবশ্যক।

বিদ্যালয়ে ফলফুলের বাগান থাকা উচিত। ফলফুলের বাগানের কাজের মাধ্যমে শিশুরা শিক্ষণীয় নানা বিয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং তাদের সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশীলতা বিকাশ লাভ করে।

বিদ্যালয়ের অতি নিকটে শিক্ষকাবাস থাকবে। তাতে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও ছাত্রদের বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ হয়, বিদ্যালয়ের বাগান দেখা-শোনার সুবিধা হয় এবং বিদ্যালয়ে জীবজন্তু পোষার সুযোগ হতে পারে।

মোটের উপর, বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিবেশ এমন হবে যে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে আসতে ও থাকতে উৎসাহ বোধ করে, বিদ্যালয়কে নিজেদের গর্বের বস্তু বলে বোধ করে এবং পরিবেশের প্রভাবে তাদের মনে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধ জন্মে। বিদ্যালয় যাতে গ্রাম-বাসীদেরও গর্বের বস্তু হয়—সে রকম পরিবেশ রচনা করতে হবে।

* * * *

পূর্বেই বলা হয়েছে যে আধুনিক শিশুশিক্ষায় শিশুর স্বাভাবিক খেলাধূলা, কাজকর্ম প্রভৃতিকে ভিত্তি করেই তার শিক্ষা সুরু হয়। এতে শিশু শিক্ষায় আগ্রহী হয় ও শিক্ষা বদ্ধমুল হয়। আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম তিন শ্রেণীতে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা থাকবে। পরবর্তী দুই শ্রেণীতে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা ও বৌদ্ধিক শিক্ষা পৃথক করা হবে। তাই, প্রথম তিন শ্রেণীতে শ্রেণী-শিক্ষক থাকবে ও পরবর্তী দুই শ্রেণীতে শ্রেণী-শিক্ষকের সংগে বিষয়-শিক্ষকও কাজ করবেন।

শ্রেণী-শিক্ষকের উপর তাঁর বিশেষ শ্রেণীর সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা-দানের ও সেই শ্রেণীর শিশুদের সর্বাংগীন বিকাশের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। শ্রেণী-শিক্ষকের সংগে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। বিদ্যালয়ের অপরিচিত পরিবেশে একই লোকের আশ্রয়ে থাকার ফলে শিশুরা নিরাপদ বোধ করে এবং তাঁর কাছে তারা ক্রমশ নির্ভয় ও নিঃসংকোচ হয়ে ওঠে। শিক্ষকও তাদের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তাদের ভালমন্দ, সুখ-সুবিধা ও প্রয়োজন বিশেষভাবে জানেন ও তাদের প্রতি স্নেহশীল হয়ে ওঠেন। ছাত্র-শিক্ষকের এ নিকট আন্তরিক সম্পর্কের ফলে শিশুর শিক্ষা সহজ, আনন্দদায়ক ও দ্রুত হয়। সকলের শক্তি-সামর্থ্যের সঠিক খবর শিক্ষকের জানা থাকাতে যার বিশেষ সাহায্যের দরকার এমন অনগ্রসর শিশুকে তিনি বিশেষ সাহায্য করতে পারেন।

মনের অখণ্ডতা ও জ্ঞানের অবিভাজ্যতার প্রতীতির ভিত্তিতে আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক শিশুশিক্ষার প্রতিষ্ঠা। ঘড়ি-ঘণ্টার হিসাবে পৃথক পৃথক সময়ে পৃথক পৃথক বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানদান বা

ছাত্রদের সে-জ্ঞান গ্রহন অযৌক্তিক। এদিক থেকে দেখতে গেলে, শ্রেণী-শিক্ষকের ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষক ও অভিভাবকের যোগাযোগ স্থাপনের দিক থেকেও শ্রেণী-শিক্ষকের ব্যবস্থা সুবিধাজনক।

তবে, শ্রেণী-শিক্ষকের কাজ তাঁর কাছে একঘেয়ে ঠেকতে পারে এবং এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণী ও শিক্ষকের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষকের সব বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার। শিশুরা সবই তাঁর কাছে জানতে চাইবে।

এ ব্যবস্থায় শিশুরা একমাত্র শিক্ষকের প্রভাবাধীন হয়ে তাঁর দোষগুণ দুই-ই অনুকরণ করতে পারে।

প্রধান শিক্ষকের উপযুক্ত পরিচলনায় বিভিন্ন শ্রেণী বা শিক্ষকের অন্যায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি না হতে পারে। শিক্ষক নিজের মনের সরসতায় এবং নানা কর্ম উদ্ভাবনে কাজের একঘেয়েমি দূর করতে পারেন। শ্রেণী-শিক্ষক নিজের দোষগুণ জেনে দোষগুলো সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হবেন। শিশুর কাছে নিজের অজ্ঞতা লুকাবেন না—অকপটে স্বীকার করবেন। যা জানেন না তা কোন পুস্তক থেকে বা অপরের কাছে থেকে জেনে নেবেন। তাঁর জানার আগ্রহ এবং সত্য স্বীকৃতিই শিশুর অনুকরণীয় আদর্শ হবে।

শ্রেণী-শিক্ষক দুই রকম হতে পারে। কোন বিশেষ শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক ঃ প্রথম শ্রেণীর যিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক। প্রতি বছরই তিনি প্রথম শ্রেণীর ভার নেন। (২) কোন বিশেষ ছাত্রদলের শ্রেণী-শিক্ষক ঃ প্রথম

বছর তিনি প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক ঃ বৎসরান্তে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠল আর তখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভার নিলেন এবং এভাবে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত তিনি একদল ছাত্র পরিচালনা করলেন।

শিশুরা যখন শুধু জানার জন্য জানতে চাইবে তখন থেকে বিষয়ানুযায়ী শিক্ষা ও বিশেষজ্ঞ বিষয়-শিক্ষকের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। বিষয়-শিক্ষকের প্রধান অসুবিধা এই যে তিনি শুধু কিছুক্ষণের জন্য এক বিষয় পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন না। এ অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি পাঠ পরিকল্পনার কালে শ্রেণী-শিক্ষকের সংগে মিলে কাজ করলে তাঁর কাছ থেকে ছাত্রদের সম্পর্কে ও শ্রেণীর বিভিন্ন কাজ-কর্মের সম্পর্কে সব খবর পেতে পারেন। পাঠ্যবহির্ভূত নানা কাজকর্মে, খেলাধূলায় ছাত্রদের সংগে মিশেও ছাত্রদের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

শ্রেণী-শিক্ষকের ক্ষেত্রে একদল ছাত্র নিয়েই কাজ করার জন্য যেমন একঘেয়েমি আসতে পারে বিষয়-শিক্ষকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীতে একই বিষয় পড়াতে একঘেয়েমি আসতে পারে। পাঠ-দানের বিভিন্ন পরিকল্পনা এ একঘেয়েমি দূর করতে পারে।

শ্রেণী-শিক্ষক বা বিষয়-শিক্ষক যাই হোন, শিক্ষকের কতগুলো সাধারণ গুণ না-থাকলে শিক্ষকতায় সাফল্য লাভ করা যায় না এবং তাঁকে দিয়ে ছাত্রের জীবনে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয় না। "সুশিক্ষক স্বাভাবতই সরল, অবিকলাংগ, কষ্টসহিষ্ণু এবং তীক্ষ্ণধী ও স্মৃতিসম্পন্ন হইবেন। তাঁহার যথেষ্ট পরিমানে কল্পনা, প্রত্যুৎপন্ন—

মতিত্ব, পর্যবেক্ষণ-শক্তি, বিচার ও যুক্তি থাকা প্রয়োজন। তাঁহার মেজাজ সুস্থির ও স্বভাব ধীর হওয়া আবশ্যক। শিক্ষক শিশুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, স্নেহশীল, দয়াবান, প্রফুল্লচিত্ত, সবল ও ভদ্র হইবেন। মৌলিকতা শিক্ষকদের একটি প্রকৃষ্ট গুণ। ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়চিত্ততা ও সংস্বভাব শিক্ষকতার ভিত্তিস্বরূপ। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের কৌশল, ভাষাশক্তি, শিক্ষাপ্রণালীর চমৎকারিত্ব, রসজ্ঞান, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মাধুর্য, আত্মপ্রত্যয় সফলতার পরম সহায়ক। গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত দূষণীয়। অবস্থা আয়ত্তীকরণ ক্ষমতা একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ।" (শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান ; শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য : পৃঃ ১৭)

শিক্ষকের একটা নিজস্ব জীবনাদর্শ থাকা বাঞ্ছনীয়। আধুনিক শিশু-শিক্ষার শিক্ষকের শিশুদের উপযোগী নানা খেলাধূলা ও নানা-রকম কাজকর্মে কুশলী হওয়া দরকার এবং ঐ কাজগুলোর প্রতি তাঁর অনুরাগ থাকা দরকার।

প্রধান শিক্ষকের শিক্ষকতার সাধারণ গুণগুলো ছাড়াও কতগুলো বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তিনি অভিজ্ঞ ও ভুয়োদর্শী হবেন, নিরপেক্ষ হবেন ও উদার সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন। তিনি সকলের সংগে সহযোগিতা ও সকলের উপর নেতৃত্ব করবেন। ন্যায়পরায়ণতা তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক। তিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অধ্যাপনায় অপর সকলের চেয়ে বড় হবেন। নচেৎ অপরকে পরিচালনা বা সংশোধন করা তাঁর পক্ষে দুরূহ হবে।

সমস্ত বিষয়ে অন্যের চেয়ে বড় হয়েও তিনি আত্মম্ভরী বা

স্বৈরাচারী হবেন নাঃ বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব তাঁর একার পাওনা এরকম ভ্রান্ত ধারণায় তিনি সহকর্মীদের ক্ষুণ্ণ করবেন না,—বিদ্যালয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র অপরিসর করে তুলবেন না। তিনি সহকর্মীদের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে কর্ম ও দায়িত্ব বণ্টন করবেন, সকলকে সহযোগিতার সমান সুযোগ দেবেন এবং সকলের সংগে নিজে সমান সহযোগিতা করবেন। তিনি, ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া, অভিভাবকদের সংগেও সম্পূর্ণ সহযোগিতা রক্ষা করবেন।

বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতির সভা-ডাকা, সভার বিবরণী রাখা, নানা প্রতিষ্ঠানের সংগে ও স্কুল-বোর্ডএর সংগে এবং শিক্ষা-বিভাগের সংগে সংযোগ-রাখা ও চিঠিপত্র আদানপ্রদান, হিসাব-রাখা ইত্যাদি নানা কাজ প্রধান শিক্ষককে করতে হয়। বিদ্যালয়ের যে-কোন আকস্মিক সমস্যার সমাধান তাঁকেই করতে হয়। এসকল কার্য্য সম্পাদনের যোগ্যতা প্রধান শিক্ষকের থাকা আবশ্যক।

* * * *

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে আধুনিক শিশুবিদ্যালয় একটি ছোট্ট গণতন্ত্ররূপে পরিচালিত হবে। এ গণতন্ত্রে শিক্ষক শিশুদের উপর তাঁর মতামত চাপাবেন নাঃ অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে তিনি পরামর্শ দেবেন মাত্র। গণতান্ত্রিক শিশু-বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণীও এক একটি গণতন্ত্র। প্রত্যেক শ্রেণীর বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা অনুসারে বিভিন্ন নায়ক বা 'মন্ত্রী' নির্বাচিত করে নিতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণীর কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন শ্রেণীমন্ত্রী, একজন কৃষিমন্ত্রী একজন শিল্পমন্ত্রী, একজন সাফাইমন্ত্রী প্রভৃতি নির্বাচিত হবে। এরা নিজ নিজ কাজের পরিকল্পনা করবে ও তা শ্রেণীর সম্মুখে

উপস্থাপিত করবে। শ্রেণী সে পরিকল্পনা আলোচনা করে গ্রহণ করলে সে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলবে। শিক্ষক আগাগোড়াই নেপথ্যে থেকে সব পরিচালনা করবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতি সপ্তাহে ও তৃতীয় শ্রেণী হতে উপরের শ্রেণীগুলোতে প্রতি মাসে মন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারে। একদল মন্ত্রীর কার্যকাল শেষ হলে তারা তাদের কাজের বিবরণী শ্রেণীর সম্মুখে উপস্থিত করবে এবং আবার নূতন মন্ত্রীদল নির্বাচিত হবে।

দিনের কাজ সুরু হবার আগে প্রত্যহ সমবেতভাবে কোন সুন্দর আদর্শযুক্ত গান গাওয়া হবে। তারপর গ্রামের ও দেশের খবর আলোচনার পরে সেদিনকার কাজের পরিকল্পনা হবে। শ্রেণী-মন্ত্রী পরিকল্পনা গ্রহণে প্রধানের অংশ নেবে। বিভাগীয় মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের কাজের পরিকল্পনা গ্রহনে প্রধান অংশ গ্রহণ করবে।

একদিনের কাজের পরিকল্পনার নমুনা নীচে দেওয়া গেল :—

বেলা ১১টা থেকে ১১-৩০ মিঃ—সমবেত সংগীত ; খবর বলা ;
পরিকল্পনা গ্রহণ।

১১-৩০ মিঃ থেকে ১২-১৫ মিঃ— শিল্পকাজ বা সৃজনাত্মক কাজ।

১২-১৫ মিঃ থেকে ১২-৩৫ মিঃ— কাজের হিসাব।

১২-৪৫ মিঃ থেকে ১টা বিশ্রাম।

বেলা ১টা থেকে ১-৩০ মিঃ কবিতা বা ছড়াপাঠ।

১-৩০ মিঃ থেকে ২টা গল্প বলা বা অভিনয়ের প্রস্তুতি।

বেলা ২টা থেকে ২-৪০ মিঃ লেখা (ডায়েরী)।

২-৪০ মিঃ থেকে ৩টা— বাগানের কাজ।

বেলা ৩টা থেকে ৩-৩০ মিঃ— বাগানের কাজের আলোচনা।
৩-৩০ মিঃ থেকে ৪টা— খেলাধূলা বা বেড়ান।
[অথবা, বেলা ২টা থেকে বেলা ৪টা ঃ ভ্রমণ পরিকল্পনা ও ভ্রমণ]

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে সকালের দিকটায় কাজকর্ম, বেলা একটা থেকে ৩-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়ানুযায়ী পড়াশুনা ও তার পরের এক ঘণ্টা বাগানের কাজ, ভ্রমণ, অভিনয়ের প্রস্তুতি, লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ইত্যাদি রাখা যায়। শেষ দুই শ্রেণীতে পড়াশুনার উপর কিছু বেশী জোর দিতে হবে।

ভ্রমণের জন্য আগেই পরিকল্পনা করে নিতে হবে। প্রত্যেক ছাত্র ভ্রমণের বিবরণ রাখবে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য ভ্রমণ বিশেষ উপযোগী। শিশুদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে, পর্যবেক্ষণ দ্বারা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে বলতে হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য আগেই প্রশ্ন প্রস্তুত করে দেওয়া যেতে পারে।

সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য সমবেত কার্যসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে—যেমন, গ্রাম-সাফাই, চড়ুইভাতি, কোন বিশেষ উৎসব পালন। এজন্য সমগ্র বিদ্যালয়ের একজন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারে। সে তার প্রয়োজনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ইত্যাদি নির্বাচিত করে নেবে।

* * * *

সময়-পত্রিকা (Time table) রচনা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলো সাধারণ ভাবে স্মরণীয় ঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিষয় অনুসারে সময় পত্রিকা রচনা করা হবে না, কাজ অনুযায়ী হবে—যথা, (১) শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার

করা, (২) প্রার্থনা বা সমবেত কাজ, (৩) বাগানের কাজ, (৪) পুতুল গড়া, (৫) গল্প বলা, (৬) ছুটাছুটি খেলা, (৭) গান করা, (৮) ছবি আঁকা, (৯) গল্পের বই পড়া, (১০) অভিনয় করা, বা অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া, (১১) ভ্রমণ প্রভৃতি।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে ধীরে ধীরে বিষয়ানুযায়ী সময় পত্রিকা রচনা করা যেতে পারে ঃ যথা, (১) সাহিত্য, (২) গণিত, (৩) ইতিহাসের গল্প ইত্যাদির সংগে (ক) বাগানের কাজ, (খ) ছবি-আঁকা, (গ) শিল্প কাজ, (ঘ) অভিনয় প্রভৃতি।

সাহিত্য প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ দেবার প্রয়োজন সেগুনো প্রথমের দিকে থাকবে এবং এ রকম কোন বিষয়ের পর শিশুদের মানসিক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য আনন্দদায়ক কার্যক্রম থাকবে। খেলা, কাজ, চিত্রাংকন, ভ্রমণ প্রভৃতির দ্বারা মানসিক ক্লান্তি দূর হয়।

প্রথম দুই শ্রেণীতে প্রত্যহ চার ঘণ্টা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে সাড়ে চার ঘণ্টা ও পঞ্চম শ্রেণীতে পাঁচ ঘণ্টা শ্রেণী-কার্য চলা উচিত। শেষ তিন শ্রেণীতে দুই ঘণ্টা বৌদ্ধিক বিষয় পাঠন চলবে এবং অবশিষ্ট সময় কাজকর্ম, খেলাধূলা ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা বা পরিকল্পনা চলবে।

প্রতি শ্রেণীতেই শরীর-চর্চার জন্য সপ্তাহে দুই-তিন দিন ব্যবস্থা রাখা উচিত। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে খেলা ও তদুপরি অংগ-সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকবে। শরীর-চর্চা আর খেলাধূলা দিনের কাজের শেষের দিকে থাকবে।

শ্রেণী বসার পূর্বে সামান্য অংগ-সঞ্চালন রাখা মন্দ নয়।

দিনের কাজের মধ্যভাগে অন্তত ১৫ মিনিট বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখা বিধেয়।

*   *   *

জীবন ও কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পাঠদান সম্পর্কে প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও বিবরণীর গুরুত্ব সমধিক। পূর্বপ্রস্তুতি না থাকলে শিক্ষক কাজও পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে বৌদ্ধিক ও অন্যান্য নানা খাতে প্রবাহিত করতে পারবেন না এবং কাজও পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার অনেক সুযোগ অব্যবহৃত থেকে যাবে। তাই, শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি অত্যাবশ্যক। পরিকল্পনা সে পূর্বপ্রস্তুতিরই বিবরণ এবং বিবরণী হচ্ছে যে-পাঠ দেওয়া হল পাঠদানান্তে তার বিবরণ। দুটো পাশাপাশি রাখা ভাল।

প্রথমে শিক্ষক তার শ্রেণীতে সারা বছরে কী কী কাজ এবং কোন্ সময়ে কোন্‌টা করবেন তার একটা খসড়া তৈরি করবেন। সব কাজ যেমন সব সময়ে করান যায় না তেমনই সব সময়ে সব পাঠ হৃদয়-গ্রাহী হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে শীতকালে গ্রীষ্মের বর্ণনামূলক কবিতা হৃদয়গ্রাহী হয় না। বার্ষিক পরিকল্পনার একটি নমুনা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল ঃ—

চতুর্থ শ্রেণী

মাস	কতদিন কাজ হবে	কাজ	পাঠ				
			সাহিত্য	গণিত	পরিবেশ পরিচিতি		
					ইতিহাস	ভূগোল	বিজ্ঞান
জানুয়ারী	২৪ দিন	কৃষি :— শীতের শব্জি চাষ উৎসব :— নেতাজী দিবস সাধারণতন্ত্র দিবস গান্ধীমহাপ্রয়ান দিবস	গান্ধীজীর বিলাতের জীবন : স্বাধীনতা : কবিতা : রচনা : লেখা :	মণ, সের, ছটাক : টাকা, আনা, পাই : ও কাপড়ের দৈর্ঘ্যের হিসাব	বৃটিশ সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতার কথা	মণিপুর অঞ্চল ও বাংলা দেশ	সূর্যের অয়ণগতি ও ঋতু : শীতের ফসলে রৌদ্রের প্রয়োজন কেন

এ ভাবে অন্যান্য মাসের কাজের পরিকল্পনা লিখে যেতে হবে।

বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে মাসের পরিকল্পনা আসবে। নমুনা নীচে দেওয়া গেল :—

চতুর্থ শ্রেণী : জানুয়ারী মাস ; কার্যদিন ২৪ ;

সময়—প্রতিদিন ৪॥ ঘণ্টা হিসাবে ১০৮ ঘণ্টা

কাজ	সময়
কৃষি :—	
বেড়া-দেওয়া	৪ ঘণ্টা
নিড়ান	৪ ,,
চারা-বসান	৪ ,,
সেচ	৪ ,,
	১৬ ঘণ্টা
উৎসব :—	
পোষাকাদি তৈরী	৪ ঘণ্টা
মঞ্চ তৈরী	২ ,,
প্রস্তুতি ও অন্যান্য কাজ	৪ ,,
উৎসব অনুষ্ঠান	১ ঘণ্টা
	১১ ঘণ্টা
বিদ্যালয় প্রস্তুতি প্রত্যহ ১৫ মিনিট	৬ ,,
খেলাধূলা ৮ দিন ৩০ মিঃ হিসাবে	৪ ,,
বিশ্রাম— ২০ দিন ১৫ মিনিট হিসাবে	৫ ,,

পাঠ

বিষয়	সময়
সাহিত্য	১৮ ঘণ্টা
গণিত	১৬ ,,
ভূগোল	৪ ,,
ইতিহাস	৪ ,,
বিজ্ঞান	৪ ,,
বিবরণী আদি লেখা	৮ ,,
	৫৪ ঘণ্টা

কাজ	সময়
প্রস্তুতি ও সূতা কাটা ৮ দিন ঃ ১ ঘণ্টা হিসাবে	৮ „
	২৩ ঘণ্টা
ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ	৪ ঘণ্টা
	মোট ৫৪ ঘণ্টা

৫৪ ঘণ্টা + ৫৪ ঘণ্টা = ১০৮ ঘণ্টা

সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-এর অন্তর্গত বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় বার্ষিক পরিকল্পনায় দ্রষ্টব্য।

দৈনিক পরিকল্পনা ও বিবরণীর নমুনা ঃ

তারিখ ……………শ্রেণী……ছাত্র সংখ্যা…………মোট সময়……………

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উপকরণ	শ্রেণী পরিচালনা	বিবরণী
বেলা ১১টা থেকে ১১-৩০ মিনিট	সাফাই, সমবেত সংগীত, খবর-বলা	সাফাই উপকরণ, ফুলদানী, ধূপদানী, ধূপ, সংবাদপত্র	পরিকল্পনা অনুযায়ী সাফাই মন্ত্রীর নেতৃত্বে সাফাই—শ্রেণী সাজানর পর "ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা" গান — খবর বলা ঃ আমি "নেতাজী দিবস" পালনের কথা খবর হিসাবে বলব।	পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে।

(এ ভাবে পর পর লিখে যেতে হবে।)

বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা প্রধানশিক্ষকের নেতৃত্বে সকল শিক্ষকের সহযোগিতায় প্রস্তুত হবে। (তাছাড়া, যে-কোন উৎসব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সমস্ত শিক্ষক মিলে প্রধান শিক্ষকের পরিচালনাধীন প্রস্তুত করবেন।)

মাসিক পরিকল্পনা ও পূর্ববর্তী দিনগুলির বিবরণী অনুসারে প্রত্যহ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। দৈনিক বিবরণী থেকে সমগ্র মাসে অগ্রগতি কতটা হল তার বিবরণী করে, বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে মাসিক পরিকল্পনা রচিত হবে।

প্রধান শিক্ষক শিক্ষকের বিবরণী দেখে শ্রেণীর কাজের ও শিক্ষকের কাজের অগ্রগতি নির্ণয় ও পরিমাপ করতে পারবেন।

* * * *

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ধারণা যে বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে লেখাপড়া শেখান ও গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের বৌদ্ধিক জ্ঞান লাভে সাহায্য করা। কিন্তু, মাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ হলেই শিশুর যথার্থ শিক্ষা হল এ ধারণা ঠিক নয় এবং যদি শিশুর শরীর ও কর্মক্ষমতার যথোপযুক্ত বিকাশ না ঘটে তা হলে তার বৌদ্ধিক অগ্রগতিও আশানুরূপ হয় না। এ জন্য শিশুর শরীর, আচার-ব্যবহার, কর্মক্ষমতা ও মন যাতে ঠিকমত বিকশিত হবার সুযোগ পায় এমন কার্যক্রম বিদ্যালয়ে রাখা উচিত। শরীর চর্চা, খেলাধূলা, চিত্রাংকন, বিতর্ক-সভা, সাহিত্য-সভা প্রভৃতি ব্যবস্থা আধুনিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে স্থান পেয়েছে। এককালে এগুনোকে উদ্বৃত্ত কার্যক্রম হিসাবে দেখা হত। কিন্তু বর্তমানে

এগুনোকে আর উদ্বৃত্ত কার্যক্রম হিসেবে না দেখে, বৌদ্ধিক বিষয়ের মতই গুরুত্বযুক্ত কার্যক্রম হিসাবেই ধরা হয়।

অনেকে মনে করেন এ সব কার্যক্রম সম্ভবত উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নহে। কিন্তু ছোটদের বিকাশ-শীলতাকে সর্বতোমুখী রাখার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এগুনোর উপযোগিতা সর্বাধিক।

চড়ুইভাতি, ভ্রমণ, সাহিত্য-সভা, ছোটখাট অভিনয়, সেবাদল গঠন, আলোচনা সভা প্রভৃতি পরিচালনার জন্য বিশেষ কোন খরচের প্রয়োজন হয় না। অল্প খরচে অনেক রকম খেলাধূলার ব্যবস্থাও করা যায়। এ সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের শৃংখলা ও সুরুচিবোধ, সংগঠনক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি, ভাষাজ্ঞান প্রভৃতির বিকাশ ঘটে এবং তারা তাদের বৌদ্ধিক জ্ঞান প্রকাশের সুযোগ পায়।

এ সমস্ত কার্যক্রমকে রূপদানের জন্য শিশু ও অভিভাবকদের সহযোগিতা আহ্বান করলে সাড়া পাওয়া যায়। গ্রাম্য উৎসবাদি প্রতিপালনের সময় গ্রাম্য শিল্পিগণের সাহায্য চাইলে ও নিলে শিল্পিগণ সানন্দে তা প্রদান করে ও শিল্পিগণ শিক্ষার সংস্পর্শে আসে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গ্রাম্য সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার প্রয়োজনীয়তাও আছে। এতে শিশুগণকে গ্রাম্য সমাজের দোষগুণ বুঝতে ও উন্নত সমাজের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

*　　*　　*　　*

বিদ্যালয়ের শৃংখলা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পোষণ করা ও তদনুযায়ী

বিদ্যালয় পরিচালনার গুরুত্ব অত্যন্ত। বিদ্যালয়ের শৃংখলা না থাকলে শ্রেণীকার্য অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে শৃংখলার একান্ত প্রয়োজন।

শিশুরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকলে বাহ্যত শৃংখলার যে রূপ ফুটে ওঠে তা বাঞ্ছনীয় নয়। শিশুদের মনে স্ফুর্তি না থাকলে তারা মনোযোগী হয় না; কাজেই বৌদ্ধিক বিষয় পাঠদান ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ভয়ের দ্বারা শৃংখলা সৃষ্টি করলে তার বিরুদ্ধে শিশুর মন বিরূপ হয় এবং সে বিরূপতা সর্বপ্রকার শৃংখলার নীতির প্রতিই শিশুকে বিরূপ করে। ফলে, শিশু যেখানে স্বাধীনভাবে আচরণের সুযোগ পায় সেখানেই শৃংখলা ভংগ করে।

দৈহিক শাস্তিদান ভয় দেখানোর চেয়েও খারাপ। এতে শিশুর মনে জিঘাংসা বৃত্তি জাগায়। শিশুও তার চেয়ে দুর্বলতরকে দৈহিক পীড়ন করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

যখন শিশু শৃংখলার উদ্দেশ্য বোঝে, সে নিজ প্রেরণায় শৃংখলা মানে বা শৃংখলা স্থাপনে সক্রিয় অংশ নেয়। তখন যে শৃংখলা স্থাপিত হয় তাই আদর্শ শৃংখলা। এরকম শৃংখলা সৃষ্টির প্রথম সর্ত শিশুর শ্রেণীকার্যের প্রতি সত্যিকার আগ্রহ সৃষ্টি করা। এ আগ্রহ সৃষ্টি হলে শিশুকে বুঝতে সুযোগ দিতে হবে যে শ্রেণীর বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য শৃংখলার একান্ত প্রয়োজন। তারপর যদি শিশুদের দ্বারা শৃংখলার নিয়মগুলো স্থিরীকৃত হয় এবং সেগুলো ঠিকমতো পালনের ব্যাপারে শিশুদের উপরই অধিক দায়িত্ব দেওয়া হয়, শৃংখলা ভংগের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের দায়িত্বও শিশুদের উপর ন্যস্ত হয়, তা হলে বিদ্যালয়ে যে-শৃংখলা স্থাপিত হয়

তাই আদর্শ শৃংখলা। এ শৃংখলার সংগে শিশুর স্বাধীনতা ও শিশু-গণতন্ত্রের বিরোধ থাকবে না।

বর্তমানে উপর থেকে চাপানো শৃংখলায় অভ্যস্ত শিশু দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়। যাতে শিশুরা শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঠিক মত বুঝতে পারে তার জন্য শিশুরা যে সব কাজকর্ম করতে আগ্রহী হয় সে সব কাজ কর্মের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখতে হবে। ঐ কাজগুলো ঠিকভাবে ও ভাল করে করার আগ্রহেই শিশুরা শৃংখলার প্রয়োজনীয়তা বুঝবে এবং শৃংখলা রাখতে আগ্রহী হবে। এই ভাবে শৃংখলায় অভ্যস্ত হলে শিশুরা বৌদ্ধিক বিষয়ে শ্রেণীকার্য্যেও শৃংখলা-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে।

শৃংখলাভংগের ত্রুটী সংশোধন করার দায়িত্বও শিশু নির্বাচিত বিচার-সভার হাতে দেওয়া ভাল। অবশ্য, বিচারে যেন কঠোর বা অযৌক্তিক শাস্তি দেওয়া না হয় সেদিকে শিক্ষক প্রভাব সৃষ্টি করবেন।

কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সুরু করলে শুধু উচ্চ স্তরের শৃংখলা-বোধ স্থাপিত হয় না, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোবৃত্তি ও অভ্যাস গড়ে ওঠে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটা মস্তবড় ত্রুটীই এই যে ইহাতে প্রতিযোগিতারসৃষ্টি হয় এবং তার ফলে সহযোগিতার মনোভাব নষ্ট হয়। প্রথম হবার সম্ভাবনা যার আছে সে শুধু নিজেই ভাল পড়াশুনা করতে চায়—পড়াশুনা ব্যাপারে সহপাঠীদের সাহায্য করতে চায় না। এরকম ক্ষুদ্রতা নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয়। তবুও শিক্ষার ধরণটাই এমন যে আমরা এ ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করতে পারি না। কারণ, উচ্চস্থান লাভ করতে না পারলে প্রশংসা মেলেনা।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় এরকম প্রতিযোগিতা থাকেনা। পাঁচজন মিলেমিশে কাজ না করলে কাজ ও খেলার ক্ষেত্রে সাফল্য আসে না। অথচ, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সুযোগ যে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে নেই এমন নয়। সকলের চেয়ে বেশী শৃংখলানিষ্ঠ, সেবা মনোভাব-সম্পন্ন ও কার্যোদ্যমশীল হবার আকাংখা এতেও জন্মে এবং তা পূরণের সুযোগও থাকে। সমাজকে উন্নত করতে সহযোগিতামূলক প্রতি-যোগিতা প্রয়োজন—তা আমরা সহজেই বুঝি।—আমাদের শ্রেণীকে অন্য সকল শ্রেণী থেকে পরিষ্কার রাখব, আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস নিখুঁতভাবে পালন করব, খেলাধূলায় আমরা সবচেয়ে ন্যায়-নিষ্ঠ হব—এরকম মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হলে একাধারে সহ-যোগিতার অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা লাভ ঘটে।

আমরা শ্রেণীতে কেউ কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হব না, সমস্ত শ্রেণী পড়াশুনায় সুনাম অর্জন করব—এ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে অগ্রসর শিশুরা পিছিয়ে-পড়া শিশুদের সাহায্য করে। ফলে, তারা আর পিছিয়ে পড়ে থাকেনা অথচ প্রতিযোগিতার ক্ষুদ্রতা দূর হয়। অগ্রসর ছাত্রেরাও নূতন পথে তাদের উদ্যমকে ব্যবহার করে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভের সুযোগ পায়। এরূপ সমষ্টি-বোধযুক্ত প্রতিযোগিতাকে বলা হয় "Socialistic competition" এবং সমাজের প্রগতির পথে এর অবদান অনস্বীকার্য।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়-পরিচালনা দ্বারাই এ সম্ভব।

* * * *

যে অভিভাবকগণ তাঁদের শিশুদিগকে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান না করতে পারলে বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁরা কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেন না এবং তার ফলে বিদ্যালয়ের উন্নতি ব্যাহত হয়। শিক্ষাবিদগণ যদি কোন নূতন শিক্ষানীতি বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তাঁরা বিদ্যালয়ে সে-নীতি বা পদ্ধতি রূপায়িত করতে পারেন না যতক্ষণ না অভিভাবকগণ তাঁদের সংগে সহযোগিতা করেন। অধিকাংশ অভিভাবকই শিক্ষাজগতের নিত্যনূতন চিন্তার খবর রাখেন না। তাঁরা নিজেদের বাল্যকালে যে নীতি ও পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেছেন তাতেই বিশ্বাসী হন এবং নূতন নীতি ও পদ্ধতির প্রতি সন্দেহ ও বিরূপতার ভাব পোষণ করেন। তাই, শিক্ষাপদ্ধতির কোন পরিবর্তন আনতে হলে অভিভাবকদের সে পরিবর্তনের যৌক্তিকতা বুঝবার সুযোগ দিতে হবে যেন তাঁরা সংস্কারের সমর্থক হন। সুতরাং, শিক্ষকদের সংগে অভিভাবকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

তা ছাড়া, শিশুরা দিন-রাত্রের মাত্র পাঁচ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে থাকে। —তাও প্রত্যহ নয়। বাকী সময় তারা অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে থাকে। তাই, আমরা যদি মামুলী লেখাপড়া শেখার কথা না ভেবে শিশুর সর্বাংগীন বিকাশের কথা ভাবি তাহলে শিশুর বিদ্যালয়ের জীবনের সহায়ক হিসাবেই তার বাড়ীর জীবনও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। শিশু বিদ্যালয়ে সহযোগিতা, কর্মনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা শিখবে আর বাড়ীতে ঝগড়া করবে, মিথ্যা বলবে ও কর্মের প্রতি অবজ্ঞা দেখাবে এতে সুফল হতে পারে না। তাই, ব্যাপক আদর্শযুক্ত শিক্ষানীতি জ্ঞাপনের জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা বিশেষ

প্রয়োজন। যদি শিক্ষকগণ অভিভাবকদের সংগে দেখাসাক্ষাৎ করেন, তাঁদের শিশুদের মংগল-অমংগলের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে তাঁরা সহজেই অভিভাবকদের হৃদয় জয় করতে পারেন।

শিশুদের খেলাধূলা, উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অভিভাবকগণকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। মাসে-মাসে বা বৎসরে তিন-চার বার অভিভাবক-সম্মেলন ডেকে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নাতর জন্য তাঁদের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে। তাঁরা বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখবেন, প্রতিটি কাজের তাৎপর্য বুঝবেন, সুবিধা-অসুবিধার কথা জানবেন। এ রকম সম্মেলনের ফলে তাঁরা বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

বিদ্যালয়ের অগ্রতির বিবরণ তাঁদের দেখাতে হবে। বিশেষ কোন শিশুর কোন সমস্যা তার অভিভাবকের গোচরীভূত করতে হবে। মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর সাহায্যে শিশুদের কাজকর্ম, খেলাধূলা তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপন করিতে হবে।

আধুনিক শিক্ষানীতির এক প্রধান উদ্দেশ্য শিশুকে সমাজচেতনা-সম্পন্ন করা। এ জন্য শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের হিতকর কোন কাজে প্রায়ই ব্রতী হবেন। এ সব কাজেও অভিভাবকদের সহযোগিতা আহ্বান করা উচিত। এরূপ কাজ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সংগে পূর্বে আলোচনা করা ভাল। তার ফলে বিদ্যালয়ের প্রতি গ্রামবাসীর আগ্রহ বাড়বে, বিদ্যালয়ের উন্নতি হবে এবং বিদ্যালয় সমাজ শিক্ষার কাজেও ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। আর, এভাবে সমস্ত গ্রামের পরিবেশই যখন প্রগতিমুখী হবে তখন শিশুকে উন্নত

ভাব ধারায় উদ্দীপ্ত করা সহজ হবে। ফলে, বিদ্যালয় কালক্রমে সমগ্র গ্রামের প্রগতি-কেন্দ্রে পরিণত হবে।

তবে, শিক্ষকের শুধু শিশুপাঠ্য বিষয়গুলোর জ্ঞান থাকলেই চলবে না। তাঁহাদিগকে উন্নত সমাজ-চিন্তার অধিকারী ও প্রগতিধর্মী হতে হবে। তাঁরা হবেন সমাজের আদর্শ নাগরিক।

* * *

কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়সমূহ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করছিল। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ও কার্যক্রমের সংগে বৃহত্তর সমাজের যোগাযোগ ছিল না। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা ছিল অস্বাভাবিক এবং এর ফলে শিক্ষা মারফত সমাজোন্নয়ন সম্ভব হয় নি। ছাত্রেরা দিনের কিছু অংশ বিদ্যালয়ে এক কৃত্রিম শিক্ষা লাভ করত এবং তাদের বাস্তব জীবনে সে-শিক্ষা আশানুরূপ সুফলজনক হত না।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশ এই যে বিদ্যালয়ের ও সেখানকার কাজের সংগে সমাজের ও সমাজজীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে ঃ শিক্ষক হবেন সমাজসেবক এবং বিদ্যালয় হবে প্রগতি-ধর্মী গ্রাম ও সমাজোন্নয়ন-কেন্দ্র এবং শিক্ষা সমাজজীবনকে উন্নত করবে।

সমাজে বিদ্যালয়ের স্থান, গ্রাম ও সমাজসেবক হিসাবে ছাত্রদের ও অভিভাবকদের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় শিক্ষকের বিভিন্ন সমাজোন্নয়ন-প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি এ পুস্তকের নানাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সমস্ত আলোচনার গোড়ার কথা এই যে, শিক্ষক কখনই মনে করবেন না যে ছাত্রদের লেখাপড়া

আর অংক শেখালেই তাঁর কর্তব্য শেষ হল। তাঁর শিক্ষা ও কার্য দ্বারা সমগ্র সমাজে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা জাগরিত করতে হবে—তাঁর মারফত গ্রামে প্রয়োজনীয় নানা খবর আসবে, গ্রামে সংঘবোধ উদ্বুদ্ধ হবে।

গ্রামবাসীদের মনে সংঘবোধ জাগরিত করতে পারলে তৎপরবর্তী ধাপে গ্রামবাসীরা সমবায় মারফত অতি সহজে গ্রামের সব অভাব অভিযোগ দূর করতে পারবে। সমবায়ের নীতি আধুনিক পৃথিবীতে প্রায় সর্বক্ষেত্র প্রযুক্ত হয়েছে। আমাদের গ্রামসমূহে অবশ্য ধীরে ধীরে ও ধাপে-ধাপে সমবায় নীতির প্রবর্তন ও প্রয়োগ করতে হবে। সমবায় নীতির সফল প্রয়োগের জন্য পরার্থপরতা, ঐক্যবোধ ও সততার সংগে জনসাধারণের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আমাদের দেশে সমবায়-নীতির অসাফল্যের সব চেয়ে বড় কারণ জনসাধারণের অজ্ঞতা। আমাদের গ্রামে কৃষিতে প্রথম সমবায় প্রবর্তন করা যেতে পারে। গ্রামবাসীরা যদি তাদের উৎপন্নদ্রব্য সমবায়-সমিতি মারফত বিক্রয় করে এবং তাদের অত্যাবশ্যক বীজ, সার, লাংগল-বলদ সমবায় সমিতি মারফত খরিদ করে তবে তারা সহজে এবং শীঘ্র সমবায়ের সুফল বুঝবে ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায়-নীতি প্রয়োগের জন্য উৎসাহী হয়ে উঠবে।

সমবায়ের মৌলিক নীতিসমূহ, আমাদের দরিদ্র গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের অত্যাবশ্যকতা, সমবায়-সমিতি গঠন ও তার কার্যাদি পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষক জানবেন ও গ্রামবাসীদের জানাবেন।

আমাদের দেশে সরকারী পরিচালনাধীন এক সমাজোন্নয়ন

পরিকল্পনা অনুসারে বহু গ্রামে কাজ আরম্ভ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গ্রাম্যজীবনোন্নয়ন এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এ পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতার উপর। শিক্ষক এ বিষয় সকল সংবাদ সংগ্রহ করবেন ও গ্রামবাসীদের জানাবেন। শিক্ষক গ্রামবাসীদের আত্মচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করবেন।

সরকারী ও বেসরকারী যে-কোন গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টার সংগে শিক্ষক নিজেকে যুক্ত করবেন। আজ ধন-কৌলীন্যের যুগে দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষক তার পূর্বেকার সম্মানের আসনে নেই। তাকে তাঁর পূর্বগৌরবের আসন পুররুদ্ধার করতে হবে। স্বীয় চরিত্র, কার্য ও সেবা দ্বারা শিক্ষকের সে আসন পুনর্লাভ করতে হবে। শিক্ষককে তাঁর বৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতা লাভের সংগে সংগে নিজেকে গ্রামবাসীদের মংগলব্রতী বন্ধু বলে প্রতিপন্ন করতে হবে।

আমাদের দেশের "শান্তির নীড়" ছোট ছোট গ্রামগুলি আজ অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য আর কুসংস্কারে ভরা। সংহতি ও সংঘবোধহীন গ্রাম্য জনসাধারণের দুর্দশার জন্য সমাজ-দেহের নানা বিকারই দায়ী। তবে গ্রাম্য সমাজের অশিক্ষার দায়িত্বও অবশ্যস্বীকার্য। এ অন্ধকার দূরীকরণের দায়িত্ব শিক্ষকের সমধিক ও এ দায়িত্ব তাঁকে নিতেই হবে।

আমাদের দেশব্যাপী অশিক্ষা দূর করে গ্রামবাসীদের যোগ্য নাগরিক করে তোলার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষার (এ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।) এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার জন্য শিক্ষককে অবশ্য শ্রমদান করতে হবে।

* * *

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

প্রত্যহই পাঠদানকালে শিক্ষক পাঠের পুনরালোচনার জন্য বা ছাত্রের লব্ধজ্ঞানের পরিমাপের জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। সে পরীক্ষা পাঠদানের অংশ, সাধারণ অর্থে পরীক্ষা বলে গণ্য নয়। নির্দিষ্ট সময়ান্তে, কোন নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট বিষয়ে এক সংগে সকল ছাত্রের জ্ঞানের পরিমাপের বিশেষ ব্যবস্থাকেই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা বলা হয়ে থাকে।

আধুনিক কালে চলতি পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি মনোভাব গড়ে উঠেছে। এ মনোভাবের সমর্থকেরা বলেন যে চলতি পরীক্ষা দ্বারা ছাত্রের জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ হয় না ঃ বরঞ্চ শিক্ষার্থীর মনে অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার উদ্রেক করে, মুখস্থ করার প্রবৃত্তি বড় হয় এবং তার বিচার ও সৃজনী শক্তির পুষ্টি সাধন করে না। চলতি পরীক্ষায় ছাত্রের সাফল্য-অসাফল্য কিছু পরিমাণে পরীক্ষকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া এ পরীক্ষা ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

উপরোক্ত সমালোচনা নীতিগতভাবে পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে নয়—চলতি পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য আছে ঃ (১) পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীকে উৎসাহী করা যায় এবং সে তার দোষ ত্রুটী সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে ; (২) শিক্ষক তাঁর পাঠদান-পদ্ধতির সাফল্যের পরিমাপ করতে পারেন ও উন্নতিরজন্য সচেষ্ট হতে পারেন ঃ (৩) পরীক্ষায় পাঠ্যক্রমের দোষত্রুটী ধরা পড়ে—পাঠ্যক্রমকে বাস্তবাশ্রয়ী করার

সুযোগ হয়ঃ এবং (৪) পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যোগ্যতা নির্ণয় করা যায়।

আধুনিক শিশু বিদ্যালয়ে শিশুর সর্বাংগীন বিকাশ-সাধন লক্ষ্য। তাই, নির্দিষ্ট সময়ান্তে কোন পরীক্ষা দ্বারা শিশুর কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ পরীক্ষা বা পরিমাপ করা যথেষ্ট নয়। শিক্ষক প্রতিদিন শিশুর রোজকার কাজকর্ম, আচার-আচরণ ও বুদ্ধির ব্যবহার লক্ষ্য করবেন ও সে সব বিষয়ের বিবরণ রক্ষা করবেন। মাঝে মাঝে রচনা লিখতে দিতে পারা যায়। সপ্তাহের বা মাসের শেষে বৌদ্ধিক বিষয়গুলির পুনরালোচনা প্রসংগে ছাত্রদের অগ্রগতির পরিমাপ করা যায়।

আধুনিক সমালোচনায় রচনাত্মক পরীক্ষার যে সমস্ত ত্রুটী ধরা পড়েছে সেগুনো এড়াবার জন্য আধুনিক এক ধরণের প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়েছে। তথ্য-সংক্রান্ত জ্ঞান পরীক্ষায় এ ধরণের প্রশ্নের উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে। এ রকম প্রশ্নের উত্তর সুনির্দিষ্ট—সে উত্তর হয় নির্ভুল বা ভুল হবে। এতে মুখস্থের সুযোগ বা পরীক্ষকের খেয়ালে ফলের তারতম্য ঘটার আশংকা নেই। নীচে এরকম প্রশ্নের নমুনা দেওয়া গেল ঃ—

(ক) সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

১। হজরত মহম্মদ কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেন ?

২। তাঁর পিতার নাম কী ?

৩। তাঁর মায়ের নাম কী ?

৪। কাঁদের দ্বারা তিনি বাল্যে লালিত পালিত হন ?

৫। ‘পয়গম্বর’ কথার অর্থ কী ?

৬। কখন থেকে 'হিজরী' গণনা স্থরু হয় ?

৭। মহম্মদ কত বছর বেঁচেছিলেন ?

৯। মুসলমানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী ?

৮। তাঁর পরবর্তী ইসলামধর্মনায়কদের কী বলা হত ?

১০। মুসলমানদের অবশ্য বর্জনীয় দু'টি দোষের নাম কর।

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

মারাঠা জাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে —— নামে এক মহাপুরুষের নেতৃত্বে। তাঁর পিতার নাম —— আর মাতার নাম ——। তাঁর পিতা —— এর স্থলতানের অধীনে চাকুরী করতেন। শিবাজীর বাল্যের অভিভাবকের নাম ——। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে তিনি ভারতে এক —— গড়বেন। নানা বাধা জয় করে তিনি এক বিশাল রাজ্য গড়েন ও রাজ্যভিষেকের সময় তিনি উপাধি নিলেন ——। তাঁর গুরুর নাম ——। তাঁর সময়ে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ——। —— বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

(গ) সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও :—

[উদাহরণ : সংস্কৃত মহাভারত রচনা করেন বাল্মীকি, <u>ব্যাস</u>, রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত মহাভারত কে রচনা করেন—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর ব্যাস। তাই, সে নামের নীচে দাগ দেওয়া হয়েছে।]

১। গৌতমের পিতার নাম পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, শুদ্ধোদন।

২। গৌতমের মাতার নাম কুন্তী, মায়াদেবী, গান্ধারী।

৩। শুদ্ধোদন রাজত্ব করতেন কপিলাবস্তুতে, দিল্লীতে, পাটলিপুত্রে।

৪। গৌতমের স্ত্রীর নাম স্থজাতা, গোপা, দ্রৌপদী।

৫। সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করেন তাঁর ২৯, ৪৫, ৮০ বছর বয়সে।

৬। বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার করেন গয়ায়, সারনাথে, কুশী নগরে।

৭। বুদ্ধদেব নির্বান লাভ করেন পুরীতে, কুশী নগরে, কপিলাবস্তুতে।

উপরোক্ত ধরণের প্রশ্ন দিয়ে তথ্য-সংক্রান্ত জ্ঞানপরীক্ষার ব্যবস্থা করে, ছাত্রের দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, তার গৃহের ও সামাজিক পরিবেশ এবং সব মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্বন্ধীয় তথ্য সংগৃহীত হলে শিশু সম্বন্ধে সব বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হল বলা যেতে পারে।

শিশুর ঐ সকল তথ্য একটি খাতায় বা কার্ড-এ লিখে রাখা যেতে পারে এবং সেটাকে বলা হয় প্রগতি পঞ্জী। শিক্ষক তাঁর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি তিনমাস বা চারমাস অন্তর শিশুর প্রগতি পরিমাপ করবেন এবং প্রগতিপঞ্জীতে যথাপ্রয়োজন রদবদল করবেন।

বানীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগ দ্বারা রচিত ও প্রকাশিত এক প্রগতিপঞ্জীর নমুনা দেওয়া গেল। এ থেকে শিশু সম্বন্ধে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ ও কী ভাবে বিবরণ রাখা বাঞ্ছনীয় তার একটা ধারণা হবে।

প্রগতিপঞ্জীর বিবরণ অনুসারে যে সকল শিশুর সর্বাংগীন বিকাশ স্বাভাবিক মনে হবে তাদিগকে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করা যেতে পারে। যদি কোনও ছাত্র সাধারণভাবে উপযুক্ত কিন্তু কোনও বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর হয় তাকে বিশেষ শিক্ষণ ও সাহায্য দ্বারা

৬। কখন থেকে 'হিজরী' গণনা সুরু হয় ?

৭। মহম্মদ কত বছর বেঁচেছিলেন ?

৯। মুসলমানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী ?

৮। তাঁর পরবর্তী ইসলামধর্মনায়কদের কী বলা হত ?

১০। মুসলমানদের অবশ্য বর্জনীয় দু'টি দোষের নাম কর।

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

মারাঠা জাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে —— নামে এক মহাপুরুষের নেতৃত্বে। তাঁর পিতার নাম —— আর মাতাম নাম ——। তাঁর পিতা —— এর সুলতানের অধীনে চাকুরী করতেন। শিবাজীর বাল্যের অভিভাবকের নাম ——। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে তিনি ভারতে এক —— গড়বেন। নানা বাধা জয় করে তিনি এক বিশাল রাজ্য গড়েন ও রাজ্যভিষেকের সময় তিনি উপাধি নিলেন ——। তাঁর গুরুর নাম ——। তাঁর সময়ে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ——। —— বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

(গ) সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও :—

[উদাহরণ : সংস্কৃত মহাভারত রচনা করেন বাল্মীকি, <u>ব্যাস</u>, রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত মহাভারত কে রচনা করেন—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর ব্যাস। তাই, সে নামের নীচে দাগ দেওয়া হয়েছে।]

১। গৌতমের পিতার নাম পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, শুদ্ধোদন।

২। গৌতমের মাতার নাম কুন্তী, মায়াদেবী, গান্ধারী।

৩। শুদ্ধোদন রাজত্ব করতেন কপিলাবস্তুতে, দিল্লীতে, পাটলিপুত্রে।

৪। গৌতমের স্ত্রীর নাম সুজাতা, গোপা, দ্রৌপদী।

৫। সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করেন তাঁর ২৯, ৪৫, ৮০ বছর বয়সে।

৬। বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার করেন গয়ায়, সারনাথে, কুশী নগরে।

৭। বুদ্ধদেব নির্বান লাভ করেন পুরীতে, কুশী নগরে, কপিলাবস্তুতে।

উপরোক্ত ধরণের প্রশ্ন দিয়ে তথ্য-সংক্রান্ত জ্ঞানপরীক্ষার ব্যবস্থা করে, ছাত্রের দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, তার গৃহের ও সামাজিক পরিবেশ এবং সব মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্বেব বিকাশ সম্বন্ধীয় তথ্য সংগৃহীত হলে শিশু সম্বন্ধে সব বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হল বলা যেতে পারে।

শিশুর ঐ সকল তথ্য একটি খাতায় বা কার্ড-এ লিখে রাখা যেতে পারে এবং সেটাকে বলা হয় প্রগতি পঞ্জী। শিক্ষক তাঁর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি তিনমাস বা চারমাস অন্তর শিশুর প্রগতি পরিমাপ করবেন এবং প্রগতিপঞ্জীতে যথাপ্রয়োজন রদবদল করবেন।

বানীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিত্তালয়ের গবেষণা-বিভাগ দ্বারা রচিত ও প্রকাশিত এক প্রগতিপঞ্জীর নমুনা দেওয়া গেল। এ থেকে শিশু সম্বন্ধে লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ ও কী ভাবে বিবরণ রাখা বাঞ্ছনীয় তার একটা ধারণা হবে।

প্রগতিপঞ্জীর বিবরণ অনুসারে যে সকল শিশুর সর্বাংগীন বিকাশ স্বাভাবিক মনে হবে তাদিগকে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করা যেতে পারে। যদি কোনও ছাত্র সাধারণভাবে উপযুক্ত কিন্তু কোনও বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর হয় তাকে বিশেষ শিক্ষণ ও সাহায্য দ্বারা

অন্য সকলের সংগে সমান হবার সুযোগ দিতে হবে। এ রকম অনগ্রসর ছাত্রকে সাহায্যের বিশেষ ব্যবস্থা বছরের শেষের দিকে করা যেতে পারে।

শিশুরা যাতে নিজেরাই নিজেদের ক্রটী বা অনগ্রসরতা বুঝতে পারে এবং ক্রটী সারিয়ে অগ্রসর হবার জন্য উৎসাহবোধ করে তার ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রগতিপঞ্জীর নমুনা

গোপনীয়

আরম্ভের তারিখ.......... উচ্চ/নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়..................

প্রগতিপঞ্জী

নাম..

জন্ম তারিখ............দিন..............মাস...............বৎসর..............

ঠিকানা...

পরিবারে শিশুর স্থান +

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
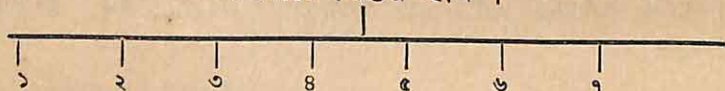
নির্দেশ—

মান লেখা থাকলে 'ক' (খুব বেশী), 'খ' (বেশী), 'গ' (সাধারণ), 'ঘ' (কম), ও 'ঙ' (খুব কম) ধরে নিয়ে লিখতে হবে ; অন্যান্য স্থানে সংখ্যায় বা সংক্ষিপ্ত ভাষায় ফরম্ পূরণ করতে হবে।

+ সংখ্যার নীচে যথাস্থানে 'ভাই' অথবা 'বোন', লিখতে হবে। যাহার প্রগতি পঞ্জী তাহার স্থানে (✓) চিহ্ন দিতে হবে।

‡ মৃত হলে কেবল মৃত্যুর তারিখ লিখতে হবে।

* শিক্ষার মান—'ক' = স্নাতকোত্তর শিক্ষা, খ = মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা, 'গ' = উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা, 'ঘ' = প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা, 'ঙ' = অশিক্ষা।

১। সমাজ ও গৃহ পরিবেশ

সম্বন্ধ ও নাম	জীবিত বা মৃত ‡	পেশা	শিক্ষা সংস্কৃতি (মান) *	সামাজিক স্থান (মান)	স্নেহ (মান)	আর্থিক অবস্থা (মান)	গৃহের শাসন (মান)	অভিভাবকের ঠিকানা ও গৃহের পরিপার্শ্ব।
পিতা শ্রী.................								
মাতা শ্রী.................								
.... (অভিভাবক) শ্রী.................								

২। বিদ্যালয়

বৎসর	বিদ্যালয়ের নাম	ভর্তি বইয়ের ক্রমিক নং	ভর্তির তারিখ	শ্রেণী	উপস্থিতি (শতকরা)	দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণ	বিদ্যালয় ত্যাগের তারিখ	ত্যাগের কারণ	নূতন বিদ্যালয়

৩। শারীরিক বিকাশ

বৎসর	মাস	উচ্চতা	ওজন	বুকের মাপ	কঠিন অসুখ বা অঙ্গবৈকল্য	সাধারণ স্বাস্থ্য (মান)	বাচনশক্তি (মান)	কর্মক্ষমতা (মান)	খেলাধূলায় অংশগ্রহণ (মান)	মন্তব্য
১৯...........	এপ্রিল									
	আগষ্ট									
	ডিসেম্বর									
১৯...........	এপ্রিল									
	আগষ্ট									
	ডিসেম্বর									
১৯...........	এপ্রিল									
	আগষ্ট									
	ডিসেম্বর									

৪। শিল্প সামর্থ্য

শিল্প কাজ			কৃত কর্মের—			
	পরিমাণ	উৎকর্ষতা	গতি	মনোভাব (attitude)	আয়	মন্তব্য
কাতাই						
কৃষি						
সঙ্গীত						
চিত্রাঙ্কন						
কাঠের কাজ						
সৃজনাত্মক কাজ						

৫। পাঠ্যবিষয়ক ক্ষমতার বিকাশ

বৎসর					
বিষয়	শতকরা নম্বর			মান	মন্তব্য
	১	২	শ্রেণীর বা বাড়ীর কাজ		
ভাষা ও সাহিত্য					
গণিত					
প্রকৃতি বিজ্ঞান					
ইতিহাস					
ভূগোল					
স্বাস্থ্য					
নাগরিক শিক্ষা					
লিখন					

* বৎসরে দু'টি পরীক্ষা হবে, তাহার নম্বর যথাক্রমে ১ ও ২ এর ঘরে লিখ্‌তে হবে; বাড়ীর ও শ্রেণীর কাজেরও নম্বর দিতে হবে। এই সমস্ত নম্বরের গড় নিয়ে মান নির্ধারণ করতে হবে।

'ঙ' = ১—১৯, 'ঘ' = ২০—৩৯, 'গ' = ৪০—৫৯, 'খ' = ৬০—৭৯, 'ক' = ৮০—১০০

৬। বিশেষ নৈপুণ্য ও অসামর্থ্য

বৎসর	নৈপুণ্য	অসামর্থ্য	মন্তব্য
১৯................			
১৯................			
১৯................			

৭১ পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ

(মান)

	১৯................			মন্তব্য
বিষয়	১	২	৩	
সাফাই				
প্রার্থনা				
আলোচনা				
বক্তৃতা				
অভিনয়				
আবৃত্তি				
নৃত্য				
রচনা				
সমাজসেবা				
উৎসবানুষ্ঠান				
শিক্ষামূলক ভ্রমণ				
প্রদর্শনী				
গৃহস্থালীর কাজ				
অন্যান্য কাজ				

৮। আগ্রহ

বিষয়	১৯............................			মন্তব্য
	১	২	৩	
ভাষা				
গণিত				
প্রকৃতি বিজ্ঞান				
ইতিহাস				
ভূগোল				
নাগরিক শিক্ষা				
স্বাস্থ্য				
দারুশিল্প				
কাতাই				
কৃষি				
সূচীশিল্প				
মাটীর কাজ				
চিত্রাঙ্কন				
সঙ্গীত				

৯ (ক)। ব্যক্তিত্বের বিকাশ

(মান)

দিক	গুণাবলী	১৯...............			মন্তব্য
		১	২	৩	
শারীরিক	শ্রমশীলতা				
	পরিচ্ছন্নতা				
	তৎপরতা				
সামাজিক	সংগপ্রিয়তা				
	সহযোগিতা				
	দায়িত্ববোধ				
	শৃংখলাবোধ				
	অপরিচিতের প্রতি আচরণ				
	রুচিবোধ				
বৌদ্ধিক	অধ্যবসায়				
	সাধারণ বুদ্ধি				
	বিচারশক্তি				
	আত্মবিশ্বাস				
	স্মৃতি				
	ঔৎসুক্য				

৯ (খ) ঃ ব্যক্তিত্বের বিকাশ

(মান)

দিক	গুণাবলী	১৯.................			মন্তব্য
		১	২	৩	
চারিত্রিক	সততা				
	নিয়মানুবর্তিতা				
	নেতৃত্ব				
	আনুগত্য				
	সত্যবাদিতা				
	দুস্থের সেবা				
	স্নেহপ্রবণতা				
	দয়া				
	ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা				
	স্থৈর্য্য				
	সাহসিকতা				
	নীতিবোধ				
	ধৈর্য্য				
	সখ (Hobby)				

১০। দিনলিপি (বিদ্যার্থীদের)

(মান)

বৎসর	সম্পূর্ণতা		নির্ভুলতা (accuracy)		নিয়মানুবর্তিতা		ক্রম (orderly-ness)		পরিচ্ছন্নতা		মন্তব্য
	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	
১৯............											
১৯............											
১৯............											

১১। সমস্যামূলক বা অসামাজিক আচরণ

বৎসর	আচরণ	অবলম্বনীয় ব্যবস্থা
১৯........		
১৯........		
১৯........		

১২। কোন শিক্ষা বা বৃত্তি অবলম্বন শ্রেয় *

মতামত দাতা	শিক্ষা	বৃত্তি	স্বাক্ষর
ছাত্র/ছাত্রী			
অভিভাবক			
শ্রেণী শিক্ষক			
প্রধান শিক্ষক			

১৯............১৯............১৯............

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর।

* অন্য শিক্ষা বা বৃত্তি গ্রহণ কালে এবং বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি স্তরের শেষে এই অংশ পূরণীয়।

॥ এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয় ॥

আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়-ব্যবস্থাপনার এক বিশেষ সমস্যা এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমাদের গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট বয়সের প্রত্যেকটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগের ব্যবস্থা করতে হলে বহু গ্রামে একাধিক শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ছাত্রসংখ্যা বা অর্থনৈতিক বিবেচনায় সমর্থনযোগ্য হবে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সবাইকে দিতে হবে। তাই, এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে আছে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে এক শিক্ষকের বিদ্যালয় চলে আসচে। সংস্কৃত টোলে আজও একজন গুরু বিভিন্ন বিষয়ের ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় ও সুইডেনে এক-শিক্ষকের বিদ্যালয় চলচে।

এক-শিক্ষকের বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা থাকলেও, আমাদের দেশে এগুলোকে তুলে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি দিয়ে এগুলোকে অধিকতর কার্যকরী করে তুলতে হবে। এ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য ঃ "Those who advocate the abolition or amalgamation or consolidation of single teacher schools have failed to visualise their indispensable place in the frame-work of the Indian educational system. * * * The right

approach to the problelem is to mend these schools rather than to end them". R. V. Parulekar : Literacy in India : Chap. X

এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সমস্যা সমূহ এই যে (১) এ শ্রেণীর বিদ্যালয় সংখ্যা যথাসম্ভব কমাতে হবে; (২) শিক্ষকদের স্বল্প বা দীর্ঘকালীন ছুটীর কালে অন্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে; (৩) শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় এ জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিচালনা বিশেষ আলোচ্য বিষয় হবে; (৪) বৎসরের প্রথমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্র ভর্তি শেষ হবে, এবং (৫) এ জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা থাকবে।—এ জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার একটা কাঠামো শিক্ষাবিভাগ উপযুক্ত অনুসন্ধান ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যানুসারে প্রথম প্রণয়ন করবে এবং পরে এ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ অনুসারে সে-কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে।

একক শিক্ষকের পাঠদানকার্য সহজ করে-তোলার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীকে নানাভাবে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। —আমেরিকায় পাঁচ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কার্যত তিন শ্রেণীর করে নেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণী স্বতন্ত্রই থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী মিলিয়ে নেওয়া হয়।

যদি কোন বিদ্যালয় চার-শ্রেণীর হয় (আমাদের দেশে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার শ্রেণীই আছে।) তবে তাকে কার্যত দুই শ্রেণীর করে নেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী মিলিয়ে নেওয়া হয়।

সুইডেনে পঞ্চম শ্রেণীকে স্বতন্ত্র রাখা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীকে মিলিয়ে নেওয়া হয় এবং এক বছর পর পর নূতন ছাত্র ভর্তি করা হয়। তার ফলে এক বছর পর পর পঞ্চম শ্রেণী থাকে না। তাই, কার্যত এক বছর দুই শ্রেণী ও পরের বছর তিন শ্রেণী থাকে।

শ্রেণীসংখ্যা ঠিক রেখে বিভিন্ন শ্রেণীকে এক সংগে বিভিন্ন বিষয় পাঠ দান করা যেতে পারে। টাস্‌ম্যানিয়ায় প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণীতে পঠন, বানান, অংক ও সূচীশিল্প সম্বন্ধে পৃথকভাবে পাঠদান করা হয়। শারীর শিক্ষা, সংগীত ও ধর্মশিক্ষা সকল শ্রেণীকে এক সংগে দেওয়া হয়। প্রকৃতি-বিজ্ঞান, অংকন ও হাতের কাজ দু'ভাগে শেখান হয়ঃ ভাষা, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল ও জ্যামিতি তিন ভাগে শেখান হয়।

তৃতীয় প্রযোজ্য পদ্ধতি সর্দার-পড়ুয়ার সাহায্য গ্রহণ (Monitorial System)। এ পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে অষ্ট্রেলিয়ায় সুফল পাওয়া গেছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষকের কাজের ভার লাঘব হয় এবং সর্দার পড়ুয়াও উপকৃত হয়। তার দিক থেকে এ পদ্ধতিকে "learning by teaching" বলা যায়। এ পদ্ধতিতে ছাত্রদের পরস্পরের সংগে সহযোগিতা বাড়ে, সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের নানা নৈতিক গুণের বিকাশ হয়।

কার্য-সমস্যা পদ্ধতি (Project Method) অবলম্বনেও এক শিক্ষকের বিদ্যালয়ের কাজ সহজ হতে পারে। (কার্য-সমস্যাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য)

॥ সামাজিক শিক্ষা ॥

আমাদের দেশের সমস্যা অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ইত্যাদি বহু, আর সর্বোপরি এ সমস্ত দূরীকরণের জন্য অত্যাবশ্যক সংহতির অভাবের মূলে আছে অশিক্ষা ও তজ্জনিত নানা সংকীর্ণতা।—তাই, আজ দেশের উন্নতির জন্য প্রথম কার্য্যসূচী হবে সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের।

সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজন স্কুল-কলেজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ও শিক্ষাদান-পদ্ধতির সংস্কার, যার ফলে আজকার বিদ্যালয়গামী কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের আনুষংগিকভাবে প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষালাভ করে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ছাত্র-সামাজ ছাড়া এক অতি বিশাল জনসংখ্যা অজ্ঞতায় ডুবে আছে। তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন অসম্ভব। দেশব্যাপী অজ্ঞতা ব্যাহত ও বিলম্বিত করছে দেশের অগ্রগতি। মূঢ় জনগণকে দিয়ে গণতন্ত্র চলে না। তাই, গোড়ার প্রয়োজন জনসাধারণের মনে জ্ঞানের উন্মেষ—Renaissance must precede Reformtion.

আজ প্রত্যেক সংস্কারকামী শিক্ষিত ব্যক্তিকে সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নিতে হবে।

সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—"To develop a broad human interest, a proper understanding of one's social and physical environment, and the social virtues of an individual to make an individual a worthy citizen in a modern democratic state."

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়-সূচী নিম্নোক্তরূপ হতে পারে :

১। কোন হস্তশিল্প :
২। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক সাহায্য (First aid)
৩। সাধারণ পৌরবিজ্ঞান :
৪। সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান (প্রধানত স্থানীয় অধিবাসীদের উপজীবিকা অনুসারে) :
৫। দেশের ইতিহাস ও ভূগোল :
৬। সাধারণ জীবনযাত্রায় অত্যাবশ্যক অংকের জ্ঞান :
৭। সর্বজনীন ধর্ম ও সদাচারের মূলনীতি :
৮। দলগত খেলাধূলা :
৯। নিরক্ষরদের লেখাপড়া।

এযাবতকাল জনশিক্ষা বলতে নিরক্ষর জনসাধারণকে অক্ষর-জ্ঞানদান বোঝাত। কিন্তু আক্ষরিক জ্ঞানলাভ সামাজিক শিক্ষালাভের আরম্ভ ও উপায় বলেই গন্য হবে—চরম বলে নয়। সামাজিক

শিক্ষা প্রচেষ্টা দেশব্যাপী অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান। শুধু নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে নয়।

নিরক্ষর জনসাধারণকে অক্ষরজ্ঞানদানের সংগে সংগেই ছবি, বক্তৃতা, ম্যাজিক লণ্ঠন, চলচ্চিত্র, রেডিও, গ্রামোফোন ইত্যাদির সাহায্যে এবং তাদের সংগে অবাধ আলোচনায় সামাজিক শিক্ষাদান স্থরু করতে হবে।

জ্ঞানদানের সংগে নানা জনহিতকর কর্মানুষ্ঠান প্রথম থেকেই স্থরু করতে হবে। এজাতীয় কাজের মধ্যে গ্রাম-সাফাই, পুকুর সাফাই, পুকুর বা কূপ-খনন, খালকাটা, রাস্তাঘাট নির্মান, ইত্যাদি ধরা যেতে পারে। এসকল কাজের মাধ্যমে নানা বিষয় জ্ঞানদানও করা যায়।

বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময় কতগুনো উৎসব অনুষ্ঠানের বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রে যাত্রা, কবি, বাউল বা ভাটিয়ালী গান, কথকতা, রেডিও, গ্রামোফোন ইত্যাদি মারফত আনন্দ পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে।

যে-অঞ্চলের জন্য সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে-অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে বার মাস সহজ চলাচল ব্যবস্থা আছে, এমন স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত হবে। গ্রাম্য বিদ্যালয় গৃহকে কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কেন্দ্রের অবস্থান অপেক্ষা কেন্দ্রের আভ্যন্তরিক পরিবেশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালকের সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে কেন্দ্রে নিয়মের বাধা-নিষেধ যথাসম্ভব কম হয় এবং স্থযোগ-স্থবিধা ভোগে

বা আচরণে কোন প্রকার অসাম্য না থাকে এবং সমবেত শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে এখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দলগত কোন ভেদ নেই।

কেন্দ্রাধ্যক্ষ যিনি হবেন তাঁর যথেষ্ট সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত সামাজিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদি ব্যক্তিগতভাবে তিনি সংগঠন কর্মে ও গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হন এবং নিরলস ও আদর্শবাদী হন তবে কাজের সুবিধা হয়।

॥ পাঠদান পদ্ধতি ॥

যখন শেখার আর শেখাবার উদ্দেশ্য ছিল নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানলাভ মাত্র, তখন পদ্ধতির উপর কোন গুরুত্বই আরোপ করা হত না, বিষয়বস্তু ছিল মুখ্য। কিন্তু আধুনিক কালে নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানলাভ-মাত্র শিক্ষা বলে বিবেচিত হয় না। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সুসম ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন ও তাকে সুস্থ নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে তার লব্ধজ্ঞান সক্রিয় করে তোলা। জ্ঞানের এ সক্রিয়তা বিশেষ পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধজ্ঞানই তার জীবনে সক্রিয় হতে পারে ঃ মুখস্থ বিদ্যালব্ধজ্ঞান সক্রিয় হতে পারে না।

কোন বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞান দান করতে পারে না। শিক্ষার্থী পরবর্তী বাস্তব জীবনে আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে লব্ধজ্ঞান ব্যাপকতর করে তোলে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞানই আদান-প্রদানে ব্যাপকতর করে তোলা যায়।

শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম উপায় তাঁর পাঠ বা শিক্ষাদান পদ্ধতি। সঠিক পদ্ধতি শুধু কোন বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট সরল ও সরস করে বা তার মনে সহজে বদ্ধমূল করে তাই নয়, সঠিক-পদ্ধতি-প্রয়োগ-নিপুণ শিক্ষকের সংগে শিক্ষার্থীর একটা সহজ সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁর পক্ষে শ্রেণী-শৃংখলারক্ষা অতি সহজ হয়।

* * * *

সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করতে শিক্ষকের জানা দরকার শিশু কী করে শেখে।

শিশু তার চারদিকে বিস্তৃত বিশাল পৃথিবীকে চেনে তার পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—মাধ্যমে। শিশুর শিক্ষায় এ সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তু সম্বন্ধে শিশুর প্রথম জিজ্ঞাসা—'এটা কী? ওটা কী?'—এ সকল জিজ্ঞাসার মৌখিক জবাবে উদ্দিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় না। কোন বস্তুর আকৃতি, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণ, ওজন, দূরত্ব প্রভৃতি জানার একমাত্র উপায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংগে সংগে মন অনুভূত বস্তু সম্বন্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অর্থ আরোপিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়ঃ যেমন, ত্বকের উদ্দীপনার ফলে স্পর্শ-অনুভূতির পর স্পর্শলব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তির উপরেই উচ্চস্তরের জ্ঞান ও চিন্তা সম্ভব। শিশুর শিক্ষায় এদিক্ দিয়ে কোন ত্রুটী থাকলে তার মানসিক বিকাশ ত্রুটীপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হয়। তাই, পিতামাতা ও শিক্ষক শিশুকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের অবাধ সুযোগ দেবেন। শিশু বইতে যা পড়ে বা শিক্ষকের বক্তৃতায় যা শোনে সে সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা না থাকলে শিক্ষায় শিশু আনন্দ পায় না এবং তার শিক্ষা বিফল হয়। তাই, আধুনিক শিশু শিক্ষায় শিশুকে তার পরিবেশ-পরিচিতির জন্য বিভিন্ন বস্তু ধরে-ছুঁয়ে, ভেংগে-গড়ে, পরীক্ষা ও যাচাই করে ও কাজে ব্যবহার করে দেখবার

সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে শিক্ষায় কাজ, ভ্রমণ ইত্যাদির যথার্থ গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

শিশু যত বড় হয়ে ওঠে পরিবেশ সম্বন্ধে তার কৌতূহল তত বাড়ে এবং সে নানা প্রশ্নে সকলকে অস্থির করে তোলে। শিশুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থেকে নিরস্ত না করে তার প্রশ্নের সহজ বোধগম্য উত্তর দেওয়াই বিধেয়।

শিশু তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্মৃতির সাহায্যে মনে সঞ্চয় করে রাখে। অচেনা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য সে নূতন ক্ষেত্রে তার পূর্বজ্ঞান ব্যবহার করে ঃ অচেনাকে চেনার সংগে তুলনা করে তাদের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অনুভব করে ও নূতন জ্ঞানলাভ করে। এভাবে সে কল্পনা, বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে তার পরিবেশ পরিচিতি সম্পূর্ণ করে তোলে। শিশুর শিক্ষায় কল্পনা, বুদ্ধি ও যুক্তির চর্চা ও বিকাশের সুযোগ আবশ্যক। তাই, আধুনিক শিশুশিক্ষায় রূপকথা ও সৃজনাত্মক কল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং শিশুর বুদ্ধি ও যুক্তির চর্চা ও বিকাশের সুযোগদানের জন্য শিশুকে কিছু করা বা বলার আগে বিচার করতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

শিশুশ্রেণীতে পাঠদানকালে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে **সব সুস্থ শিশুই ক্রিয়াশীল**। সুস্থ শিশু সাধারণত নানা খেলার মধ্য দিয়ে নিজেকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে। শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার মধ্যে তাকে নানা শিক্ষাদানের সুযোগ পাওয়া যায়। শিশু কাজ করতে করতে নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ করে। দশে-মিলে কাজ আর খেলাধূলার মাধ্যমে শিশু সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

বাগানের কাজ, পুতুল-খেলা, ছবি-আঁকা, রান্না-করা ইত্যাদি কাজ থেকে শিশু বস্তুসাপেক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

পুস্তকে বর্ণিত অভিজ্ঞতা শিশুর নিজের করে নেওয়ার পক্ষে বিঘ্ন এই যে পুস্তকে বর্ণিত জগৎ তার অপরিচিত। তাই, পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত শিশুকে মুখস্থ করতে হয়।

শিশু নীরব শ্রোতা নয়ঃ তাই, শিক্ষক অনর্গল কথা বলে যাবেন আর শিশুরা নির্বাক শ্রোতা হয়ে বসে থাকবে এ নীতি সর্বথা পরিহার্য। **শিশু নিজেই নিজের শিক্ষক।** "কাজের মাধ্যমে যেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা, সেখানে শিশুকে কাজ করতে দিতে হবে, শিক্ষক থাকবেন তার পশ্চাতে অলক্ষ্যে। আদর্শ কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান পরোক্ষ, শিশুই প্রত্যক্ষ। শিশু কাজ করবে আপন মনে; যখন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখনই কেবল সে শিক্ষকের সাহায্যের জন্য তাঁকে ডাকবে, তাঁর কাছে আসবে। শিক্ষকের পক্ষে সেই জন্য একই সময়ে হাতের কাজ পরিচালনা করা এবং লিখন-পঠনে সহায়তা করা সম্ভব। শিশু নিজে নিজেই শিক্ষালাভ করবে। শিক্ষক তাকে সহায়তা করবে মাত্র।" (শিক্ষণ-ব্যবহারিকা—পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা-অধিকার—পৃ ১৩)

* * * *

শিক্ষার্জন বিধি (Laws of Learning) শিক্ষকের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও স্মরণীয়।

যে প্রভাব ও পরিবেশে শিশু আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করে, সে প্রভাব ও পরিবেশে শিক্ষা সফল ও সন্তোষজনক হয়। অপর পক্ষে, যে প্রভাব ও পরিবেশে শিশু পীড়িত বোধ করে সে প্রভাব

ও পরিবেশে শিক্ষা বিফল হয়। তাই, শিশুর শিক্ষা প্রীতিকর ও আনন্দদায়ক করে তুলতে হয়; কোন দুঃখ, অপমান বা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা যেন শিক্ষার সংগে সংযুক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

এ নীতি অনুসারেই বিদ্যালয় ও শ্রেণীর পরিবেশ সুন্দর ও সুখকর হওয়া উচিত, পাঠ্যবস্তু শিশুর বোধগম্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠদানকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আচরণ মনোরম হওয়া উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর অনুরাগ জন্মে।

প্রশংসা ও উৎসাহ শিশুকে অনুরাগী করে এবং নিন্দা ও দমন শিশুকে বিদ্বেষী করে। শিক্ষক প্রশংসা-নিন্দা ও পুরস্কার-তিরস্কারের অতি সতর্ক ব্যবহার করবেন।

দ্বিতীয়তঃ, পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে জ্ঞান, বিদ্যা ও নিপুনতা সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়। অপর পক্ষে, অনুশীলন ও চর্চার অভাবে লব্ধ জ্ঞান, বিদ্যা ও নিপুনতা হ্রাস পায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিধি এক সংগে কাজ করে। সুখকর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বা পুনঃ স্মরণে আনন্দ আছে। তাই, আমরা সে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বা পুনঃস্মরণ করি।

তৃতীয়তঃ, শিশুর উন্মুখতা-বিমুখতা, অনুরাগ-বিরাগ, সামর্থ্য-অসামর্থ্য, প্রস্তুত-অপ্রস্তুতি শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষকের সর্বদা বিবেচ্য। স্নায়ুকোষগুলো কার্যের জন্য উন্মুখ ও প্রস্তুত থাকলে শিশু কাজে আনন্দ পায়। অপরপক্ষে বিমুখ ও অপ্রস্তুত শিশুকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সে পীড়িত হয়। তাই, শিক্ষাদান কার্যে

শিশুর স্বাস্থ্য, অবসাদ, শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযোগিতা ইত্যাদি বিশেষ বিবেচ্য এবং প্রত্যেক কাজের সূচনায় শিশুকে সে কাজে উন্মুখ করে নিতে হয়।

* * * *

শিশুর বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে উপযোগী একটা কাজ উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

কাজ ঃ বাগান করা।

প্রস্তুতি ঃ প্রথমে মৌখিক আলোচনা দ্বারা ঠিক করতে হবে কীভাবে বাগান তৈরী হবে, কোথায় কোন্ গাছ বসাতে হবে, কোন্ গাছে কী সার দিতে হবে।

কর্মপদ্ধতি ঃ ছাত্রেরা বাগানের জায়গা মাপবে, আগাছা পরিষ্কার করে মাটি প্রস্তুত করবে, প্রয়োজনমত সার দেবে এবং গাছগুলো সারি করে বসাবে। দুই সারি ও চারার মধ্যে সমান দূরত্ব থাকবে। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক চারার যত্নের ভার এক একজন ছাত্র নেবে।

কী কী বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে ঃ (১) কোন কাজ করার আগে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এ কাজের মাধ্যমে শিশুকে তা শেখান যেতে পারে। সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমাধানে তারা সচেষ্ট হবে।

(২) মাতৃভাষা ঃ মৌখিক আলোচনায় ছাত্রেরা মনের ভাব মুখে প্রকাশের সুযোগ পাবে ঃ কাজের হিসাব রাখতে কিছু লিখতে হবে। যে ঋতুতে কাজ হবে সে ঋতুর প্রাকৃতিক শোভা

সম্বন্ধে তাদের পড়ে শোনান যেতে পারে এবং সে সম্বন্ধে তারা নিজেরাও লিখতে বা পড়তে পারে।

(৩) অংক : জায়গা মাপতে ছাত্রেরা মাপতে শিখবে, তাদের গজ, হাত ইত্যাদি দৈর্ঘ্যের ধারণা জন্মাবে। গাছ মাপতে তারা স্কেল্-এর ব্যবহার শিখবে। উৎপন্ন ফসল ওজন করতে আর মূল্য নিরূপণ করতে তাদের ব্যবহারিক অংকের সংগে পরিচয় হবে।

(৪) ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি : বিভিন্ন লোকের বাগান শিশুরা ঘুরে দেখবে। চাষীরা তাদের ক্ষেতের উৎপন্ন নানা দ্রব্য কোথায় বিক্রয় করে, কোথায় হাট বসে, অন্যান্য কী সব-জিনিষ বিক্রয় হয়, তারা সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে। এ উপায়ে বিভিন্ন বস্তু ও তাদের উৎপত্তিস্থান এবং বিভিন্ন মানুষ ও তাদের জীবিকা সম্বন্ধে শিশুর যে জ্ঞান জন্মাবে তাই হবে তার ইতিহাস ও ভূগোল জ্ঞানের ভিত্তি।

(৫) প্রকৃতি-পরিচয়, বিজ্ঞান, শরীর-চর্চা ইত্যাদি : বাগানের কাজে শিশুর প্রকৃতির সংগে যে পরিচয় হবে তাই হবে তার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম সোপান।

বাগানের কাজে শিশুর অংগচালনার যথেষ্ট সুযোগ মেলে এবং খোলা বাতাসে এরকম অংগচালানায় তার স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

তবে, একথা স্মরণ রাখতে হবে যে পাঠ্য সমস্ত বিষয়ই পর্যায়-ক্রমে একটা কাজকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া যাবে—এ ধারণা ভূল। *

---

* শিক্ষণ—ব্যবহারিক (পৃ ৮-৯) থেকে এ উদাহরণ গৃহীত।

॥ ভাষা শিক্ষা ॥

প্রারম্ভিক স্তরে শিশুকে ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য তার আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সহজ ও সরল ভাষায় শিশু নিজের পরিচিত বস্তু বা নিজের কোন অভিজ্ঞতার কথা বলবে। স্তোত্রপাঠে, জাতীয় সংগীত বা অন্য কোন গান গাইতে, ছড়া বা গল্প বলতে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। শিশুর সমস্ত কাজ, তার বাস্তব পরিবেশ ও কল্পনা, তার আগ্রহ ও অনুরাগ—সমস্ত কিছু বিষয় শিক্ষক তাকে বলতে, পড়তে ও লিখতে শেখাবেন।

আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীতে ছবি ও ছড়ার বই পাঠ্য। যে শিশু ভাল করে কথা বলতে পারে না, সে অন্যের ভাব, অন্যের ভাষায় ভাল করে বুঝবে—এ আশা করা যায় না। তাই, শিশু ছড়া বলতে, রোজকার খবরাদি বলতে স্পষ্ট উচ্চারণ শিখবে এবং সংগে সংগে নিজের শব্দসম্ভার বাড়িয়ে চলবে ও বচনভংগী আয়ত্ত করবে। এ ভাবে তার ভাষা শিক্ষা সুরু হবে। যখন সে সুস্পষ্ট উচ্চারণে সরল ও শুদ্ধ ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে কেবল তখনই তার হাতে বই দেওয়া চলে।

বইর প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে শিক্ষক শিশুকে তার উপযোগী বই পড়ে শোনাবেন ও ছবি দেখাবেন।—শুধু ভাষা শিক্ষা নয়, অন্যান্য সব বিষয়ই বই ছাড়া মুখে মুখে আরম্ভ করা যেতে পারে।

শিশু সর্বদা সম্পূর্ণ বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করবে।

শিশুকে দিয়ে প্রথম কথা-বলান এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। শিক্ষক শিশুদের সংগে খোলাখুলিভাবে মিশলে তাদের জড়তা কেটে

যাবে। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহলকে কেন্দ্র করে কথোপকথন করলে সমধিক সহযোগিতা আশা করা যায়।

মনে রাখতে হবে যে ভাষা-শিক্ষা কোন নির্দিষ্ট ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিশু সব কাজেই মাতৃভাষা ব্যবহার করছে এবং দিনের সব কাজ ও খেলার মধ্য দিয়েই শিক্ষক তাকে ভাষাশিক্ষা দেবেন।

শিক্ষক শিশুদের রূপকথার গল্প, পৌরাণিক গল্প, পরীদের গল্প, গাছপালা ও জীবজন্তুর গল্প, মজার গল্প ও দেশবিদেশের ছেলে-মেয়েদের গল্প বলবেন। গল্প বলার পর শিক্ষক শিশুদের নিজের ভাষায় গল্পের পুনরাবৃত্তি করতে বলবেন। গল্প শুনে গল্প বলাতে শিশু কথার সংগে কথার সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে ও তার অর্থসংগতি ঠিক রেখে ধারাবাহিক কথা বলার অভ্যাস হবে।

শিশুদের কয়েকটি ছড়া ও কবিতা মুখস্থ করাতে হবে। মুখে মুখে বার বার ছড়া বা কবিতা বলে গেলে শিশুরা শুনে সহজেই মুখস্থ করতে পারবে। শিক্ষক অংগভংগীসহ আবৃত্তি করলে শিশুরা অধিক আনন্দ পাবে ও নিজেরাও অনুকরণ করবে। কবিতা ও আবৃত্তিতে শিশুদের ছন্দের প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে।

অভিনয় করতে শিশুরা ভালবাসে। ভাষা শিক্ষায় নাটকের ব্যবহার আধুনিক শিশুশিক্ষায় বহুলভাবে প্রচলিত। তবে নাটকের বিষয়বস্তু, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি অভিনেতা শিশুদের বয়সের উপযোগী হতে হয়।

শিশুরা বিদ্যালয়ে আসার পরই নিজেদের নাম-লেখা কার্ড থেকে যার যার নাম পড়তে ও লিখতে শিখবে। দরজা, জানালা, টেবিল,

চেয়ার, বোর্ড, কাগজ, খড়ি, বই ইত্যাদি কথাও কার্ড থেকে পড়তে ও লিখতে শিখবে।

এ সমস্ত প্রাক্-পঠন ব্যবস্থান্তে শিশুদের পড়া ও লেখা আরম্ভ করতে হবে।

শিশুকে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে পড়তে শেখানই যুক্তিসংগত। বাক্যক্রমিক পদ্ধতির মূল সূত্র এই যে (ক) বাক্যদ্বারা পড়া আরম্ভ হবে ঃ (খ) পাঠে বিচ্ছিন্ন বাক্য থাকবে না ঃ (গ) বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ পরিচিত হবে ঃ এবং (ঘ) শব্দগুলো পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হবে।

শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করে শিক্ষক কয়েকটি পাঠ তৈরী করে নিতে পারেন। বাক্যগুলো বিশ্লেষণ করে ছাত্র বর্ণ-জ্ঞান লাভ করবে। ক'টা বর্ণ শেখা হল, শিক্ষক হিসাব রাখবেন। কতগুলো বর্ণ শেখা হয়ে গেলে শিক্ষক নূতন কোন আগ্রহকে কেন্দ্র করে নূতন পাঠ তৈরী করে নূতন বর্ণ, স্বরসংযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানদান করবেন। বিচ্ছিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানদান নিষ্প্রয়োজন।

নীচে "শিক্ষণ-ব্যবহারিকা" (পৃ ৯০-৯১) থেকে কয়েকটি পাঠের নমুনা দেওয়া গেল ঃ

[শিশু একটি মাটির আম তৈরী করেছে। তার আগ্রহ মাটির আমে কেন্দ্রীভূত।]

১ম পাঠ

এটা কী? শব্দ ঃ এটা, কী, আম

এটা আম। বর্ণ ঃ এ, ট, ক, আ, ম

স্বরসংযোগ ঃ আ = া ঃ ঈ = ী

২য় পাঠ

আম গাছ কই? শব্দ: গাছ, কই, ঐ
ঐ আম গাছ। বর্ণ: গ, ছ, ই, ঐ

৩য় পাঠ

গাছে আম আছে? শব্দ: আছে
হাঁ, গাছে আম আছে। বর্ণ: হ ঁ া=হাঁ
স্বরসংযোগ: এ = ে

৪র্থ পাঠ

কী রকম আম? শব্দ: রকম, কাঁচা, পাকা, নাই
কাঁচা আম। বর্ণ: র, প, চ ন
পাকা আম নাই।

৫ম পাঠ

কাঁচা আম টক। শব্দ: টক, নয়, ভাল
কাঁচা আম ভাল নয়। বর্ণ: ট, ভ, ল
পাকা আম টক নয়।
পাকা আম ভাল।

প্রত্যেকটি বাক্য বড় বড় করে কার্ড-এ লিখে নিতে হবে। প্রত্যেকটি বাক্যের কয়েকখানা করে কার্ড থাকবে। বাক্যের বিভিন্ন শব্দগুনো পৃথক করে কেটে রাখতে হবে। প্রত্যেক বাক্যের কার্ড-এ একখানা করে ছবি থাকলে ভাল হয়। প্রত্যেকখানা কার্ড শিক্ষক ছাত্রদিগকে দেখাবেন, বাক্যের অর্থবোধক ছবি দেখাবেন, বাক্যটি পূর্ণভাবে উচ্চারণ করবেন এবং ছাত্রেরা শিক্ষকের অনুকরণে

বাক্যটি উচ্চারণ করবে। বাক্যটি শিক্ষক ও ছাত্রেরা কয়েকবার উচ্চারণ করার পরে অনেকগুলি কার্ড-এর মধ্য থেকে একটি বিশেষ বাক্যের কার্ড খুঁজে বের-করা, ছবির সংগে লিখিত বাক্য মেলান, পৃথক পৃথক শব্দ মিলিয়ে একটা বিশেষ বাক্যগঠন প্রভৃতি খেলা দেওয়া যেতে পারে।

লেখা শেখা ঃ শিশুকে লিখতে শেখাতে আরম্ভ করার আগে দেখতে হবে যে, যেসব শব্দ শিশুরা লিখবে সেগুনোর দৃশ্যরূপের সংগে শিশুদের পরিচয় যথেষ্ট গভীর হয়। এও দেখতে হবে যে শিশুদের হাত ও আঙুলের পেশীগুনো তাদের আয়ত্তাধীন হয়েছে। পেশী আয়ত্তাধীন না হলে তারা অক্ষর রেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। ছয় বছরের শিশুর সাধারণত পেশী আয়ত্তীকরণের ক্ষমতা উন্মেষ হলেও, তার বহু অভ্যাসের দ্বারা পেশীগুনোকে আয়ত্তে আনতে হয়।

লিখবার ক্ষমতার দ্রুত বিকাশের জন্য শিশুকে ইচ্ছামত আঁকতে, হিজিবিজি কাটতে দেওয়া যেতে পারে। যথেচ্ছ আঁকতে আঁকতে ও হিজিবিজি কাটতে কাটতে শিশু নিজের অজ্ঞাতে হাতের লেখার ভিত্তি স্থাপন করে। হিজিবিজি থেকে অক্ষরের আকৃতি বের করে পরে অক্ষরে পরিণত করার কৌশল শিশুকে শিখিয়ে দিতে হবে।

পড়তে আরম্ভ করার আগেই শিশু কার্ড থেকে নিজের নাম ছবি হিসেবে চিনেছে। দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, বই ইত্যাদি শব্দও সে ছবি হিসেবে চিনেছে। নাম ও এরকম অতি পরিচিত শব্দগুনো শিশুরা ছবি হিসাবেই এঁকে বা লিখে ফেলবে।

"কেবলমাত্র হস্তলিপি ও শ্রুতলিপি দ্বারা লেখা অভ্যাস করলে

শিশুরা কেবল যান্ত্রিকভাবেই লিখতে শেখে, সহজ মনের ভাবকে স্বাভাবিক প্রকাশ করার ক্ষমতা তাদের জন্মায় না।

প্রথম থেকে শিশুদের এমন বিষয় লিখতে দিতে হবে যা তাদের কাছে বাস্তব ও অর্থপূর্ণ; তাদের দৈনিক জীবনের কাজকর্ম, গান, গল্প, খেলা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার সংগে যা নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রথম থেকেই শিশুদের এমনভাবে লিখতে শেখাতে হবে, যাতে তারা লেখাকে নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করবার একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রণালী বলেই বোঝে—কেবলমাত্র একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে মনে না করে।

যতদিন না শিশুরা অনায়াসে লিখতে শেখে ততদিন হাতের লেখার সৌষ্ঠবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া চলবে না। কোনও মতে দুই একটি সহজ বাক্যকে রেখায় ফুটিয়ে তোলাই যে শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাকে আবার সুন্দরভাবে লেখার তাগিদ দিলে বেচারী বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। বরঞ্চ, সে লিখতে শিখেছে সেইজন্য তাকে প্রশংসা করলে ও উৎসাহ দিলে সে আরো বেশী করে লিখবে এবং ক্রমে তার হস্তলিপির উন্নতি হবে। শিক্ষকের নিজের হস্তলিপি সুষ্ঠু হওয়া অবশ্য প্রয়োজন, কারণ অনবরত সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখলে শিশুরা সহজেই সুন্দর ভাবে লিখতে শেখে। যে শিশুরা সুন্দর লিখতে পারে তাদের বিশেষ ভাবে প্রশংসা করলেও বাকি সব কয়টি শিশুর মনে সুন্দর ভাবে লিখবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মায়।" (শিক্ষণ-ব্যবহারিকা—পৃ ৯৭)

পূর্বে বলা হয়েছে যে শিশুদের এমনভাবে লিখতে শিখাতে হবে, যাতে তারা লেখাকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র মনে না করে এবং

লেখাকে নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করবার এক অতি প্রয়োজনীয় প্রণালী বলেই বোঝে। সৃজনাত্মক রচনার সুযোগদানের জন্য উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয়ের সাহিত্যসভায় পড়ার জন্য মৌলিক রচনায় উৎসাহী করা যেতে পারে। তাদের দ্বারা দেয়াল-পত্রিকা সম্পাদনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত-লেখান, মন্ত্রীর কার্য-বিবরণী লেখান, নাটক-রচনা ইত্যাদি প্রবর্তন করলে লেখার মাধ্যমে তাদের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ ও ক্ষমতা বাড়ে।

॥ গণিত শিক্ষা ॥

গণিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিখালে বাস্তব জীবনে গণিতের প্রয়োজনীয়তা শিশু বুঝতে পারে না। এজন্য অনেকক্ষেত্রে গণিত শিশুর নিকট অহেতুক ভয়ের বস্তু হয়ে থাকে। "শিশুর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু, যেমন বাগানে ক'টা গাছ বা বীজ পোঁতা হল, কতজন কাজ করল, কতক্ষণ কাজ করল, কত তার সূতা কাটল ইত্যাদি অবলম্বনে স্বাভাবিক উপায়ে শিশু অঙ্ক শিখবে। যখনই অঙ্কের কোন বিষয় শিশু শিখবে তার বারবার আলোচনার প্রয়োজন হবে।"

আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ, সময়, পরিমাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি সাধারণ ধারণা শিশু বিদ্যালয়ে আসার পূর্বেই লাভ করে। শিশুর পূর্বলব্ধ ধারণার উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ে অংকের কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে এমন কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিশুর ঐ সব বিষয় সম্বন্ধে অধিকতর পরিচয় লাভ হয়।

সংখ্যার পরিচয়, বাস্তব কোন জিনিষ, ছবি বা কাজের ভিতর দিয়ে দেওয়া উচিত। "তোমার কয়টি চোখ, কয়টি কান? তোমার হাতে কয়টি আংগুল? তোমরা কত ভাই-বোন? এ ঘরে কয়টি জানালা?"—এ রকম প্রশ্নের সাহায্যে শিশুকে সংখ্যা বলার অভ্যাস করান যেতে পারে।

সংখ্যা সম্বলিত ছড়ার সাহায্যে সংখ্যা বলার অভ্যাস করালে শিশুরা আনন্দের সংগে শিখতে পারে। (কারো কারো মতে সংখ্যা শেখা হয়ে গেলে ছড়া স্মারক হিসাবে বিশেষ সহায়ক।)

নীচে সংখ্যাসম্বলিত দুটি ছড়া দেওয়া গেল।

এক

মামাদের দরজায়
বাঘা থাকে এক;
তেড়ে নাহি আসে, নাহি
করে ভেক্ ভেক্।

মামাদের পুকুরেতে
আছে বড় রুই;
পশু আর মাছে মিলে
একে একে **দুই**।

মামাদের বাগানেতে
চরিছে হরিণ;
দুই পশু, এক মাছ—
দু'য়ে একে **তিন**।

মামাদের রাঙা গরু
কিবা রূপ তার;
তিন পশু, এক মাছ—
তিনে একে **চার**।

মামাদের বানরের
কি মজার নাচ!
চারি পশু, এক মাছ—
চারে একে **পাঁচ**।

মামাদের সাদা ভেড়া
উঠানেতে রয়;
পাঁচ পশু, এক মাছ—
পাঁচে একে **ছয়**।

মামাদের খরগোস
চাটে এসে হাত ;
ছয় পশু, এক মাছ—
ছয়ে এক সাত।

মামাদের পোষা মেনি
যেন বড় লাট !
সাত পশু, এক মাছ—
সাতে একে আট।

মামাদের রাজহাঁস
পুকুরেতে রয়,
পশু, পাখী, মাছে মিলে—
আটে একে নয়।

মামাদের চাকরের
হয়েছে বয়স,
সবে তারে ভালবাসে,
নয়ে একে দশ।

দুই

হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল,
রইল বাকি নয়।

হারাধনের নয়টি ছেলে
কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দু'খান হল,
রইল বাকি আট।

হারাধনের আটটি ছেলে
ব'স্‌লো খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল,
রইল বাকি সাত।

হারাধনের সাতটি ছেলে
গেল জলাশয়,
একটি সেথা ডুবে ম'ল,
রইল বাকি ছয়।

হারাধনের ছয়টি ছেলে
চ'ড়তে গেল গাছ,
একটি ম'ল পিছলে প'ড়ে,
রইল বাকি পাঁচ।

হারাধনের পাঁচটি ছেলে
গেল বনের ধার,
একটি গেল বাঘের পেটে,
রইল বাকি চার।

হারাধনের চারটি ছেলে
নাচে ধিন্, ধিন্,
একটি ম'ল আছাড় খেয়ে,
রইল বাকি তিন।

হারাধনের তিনটি ছেলে
ধ'রতে গেল রুই,
একটি খেল বোয়াল মাছে,
রইল বাকি দুই।

হারাধনের দুইটি ছেলে
মারতে গেল ভেক,
একটি ম'ল সাপের বিষে,
রইল বাকি এক।

হারাধনের একটি ছেলে
কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল,
রইল না আর কেউ !

সংখ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সংখ্যা পড়া ও লেখা আরম্ভ করা যেতে পারে। তখন শিক্ষক মনোযোগী হবেন যেন শিশুরা ক্রমিক ভাবে সংখ্যাগুলো পড়ে ও শেখে।

শ্রেণীকক্ষে 'ক্যালেণ্ডার' টাংগান থাকলে ছাত্রেরা তারিখ জানতে গিয়ে ৩১ পর্যন্ত পড়তে শিখতে পারে। পাঠ্য বইর পৃষ্ঠা দেখে আরও অনেক দূর পর্যন্ত সংখ্যা পড়তে শেখা যায়।

কোন জিনিষ একটি থাকলে 'এক' বলে এবং চারটি থাকলে 'চার' বলে—এ জ্ঞান শিশু অভিজ্ঞতা থেকে শেখে। তবে, এ ধারণা বদ্ধমূল করতে সংখ্যা ছক ইত্যাদি আবশ্যক।

সংখ্যা বলা ও পড়ার সময় শিশু যে সংখ্যাগুলো শিখবে, সেগুলো সে অংক ও কথায় লিখবে। শিক্ষক বোর্ড-এ বা মেঝেতে সংখ্যাগুলো পরে পরে লিখবেন—তাঁর লেখার উপর ছাত্রেরা লিখবে। শিশু তার কাজকর্ম উপলক্ষে যত বেশী বিভিন্ন সংখ্যার সংস্পর্শে আসবে ততই তার সংখ্যা চেনার ও লেখার সুযোগ আসবে।

শিশুরা তাদের শ্রেণীর নানাপ্রকার জিনিষ—যেমন আসন, মোড়া, তক্‌লী প্রভৃতির সংখ্যা প্রত্যেকদিন হিসাব করে মিলিয়ে রাখবে, প্রত্যেকদিন তাদের হাজিরা—উপস্থিত আর অনুপস্থিত সংখ্যা—মিলিয়ে রাখবে। এতে বাস্তব ভাবে সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা ও গণিত শিক্ষা হয়।

পল্লীঅঞ্চলের ছেলেমেয়েরা দোকান থেকে জিনিষপত্র কেনা উপলক্ষে ওজনের সংগে কিছুটা পরিচিত থাকে। সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে বিদ্যালয়ে খেলার দোকান খোলা যেতে পারে। এইভাবে খেলার মাধ্যমে শিশুদের সের, আধাসের, পোয়া, ছটাক ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। বড় ছাত্রদের দিয়ে (তৃতীয় শ্রেণী ও তদূর্ধ) সমবায় ভাণ্ডার খোলা যেতে পারে।

[আমাদের দেশে শীঘ্রই নূতন ওজন-প্রণালী প্রবর্তিত হচ্ছে। তাই, বর্তমান অভিজ্ঞতা হয়ত খুব কার্যকরী হবে না।]

আংগুল, বিঘত, হাত, ফুট, গজ ইত্যাদি রৈখিক মাপ সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবার জন্য ছাত্রদের বাগান, শ্রেণীকক্ষ, বিদ্যালয়ের সামনের মাঠ মাপতে বলা যেতে পারে। ছাত্রেরা একে অন্যের উচ্চতা মাপতে পারে। ওজন সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবার জন্য ছাত্রদের ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে।

শিশু কখন ঘুম থেকে ওঠে, কখন স্কুলে যায়, কখন স্কুল ছুটি হয়, কখন সে বাড়ী আসে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সময় সম্বন্ধে শিশুর প্রাথমিক ধারণা জন্মাতে পারে। এগুনোর উত্তরে শিশু হয়ত বলবে—ভোরবেলা সে ঘুম থেকে ওঠে, সকালে স্কুলে যায়, দুপুরে স্কুল ছুটী হয়—ইত্যাদি। এ সময়গুনোর সংগে যদি ঘড়ির

সম্বন্ধ দেখান যায়, তাহলে শিশুর সময় সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

'ক্যালেণ্ডার'-এর সাহায্যে শিশুকে বিভিন্ন বারের নাম ও কয়টি বার আছে শেখান যেতে পারে। তারপর শিক্ষক বলে দেবেন সাতটি বার মিলে এক সপ্তাহ হয়। 'ক্যালেণ্ডার'-এর সাহায্যেই মাসের নাম, কোন্ মাসে কতদিন, কত সপ্তাহ ও কয় মাসে এক বৎসর—এসকল কথা শেখান যায়।

প্রকৃত মুদ্রা দেখিয়ে টাকা-পয়সার হিসাব শেখান যেতে পারে এবং তা করা উচিত।

সংখ্যাগণনা, যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে বল-ফ্রেম, Abacus-এর ব্যবহার শিশুদের পক্ষে আনন্দদায়ক ও কার্যকরী হয়ে থাকে।

যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ বা যে-কোন অংক শেখবার কালে শিক্ষক উদ্দিষ্ট প্রক্রিয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন এবং ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে ছোট ছোট সমস্যামূলক প্রশ্ন সমাধানের মাধ্যমে অংক শেখাবেন।

নামতা মুখস্থ করার আগে ছাত্রেরা গণনার সাহায্যে নামতা তৈরী করবে। নামতা সঠিক ভাবে মুখস্থ করা আবশ্যক। শিশুরা যেন প্রথম থেকে আবৃত্তি না করেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে

॥ পরিবেশ-পরিচিতি ॥

এ যাবৎকাল শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে আমাদের দেশে ইতিহাস,

ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় কৃত্রিম উপায়ে, পাঠ্য পুস্তককে ভিত্তি করে শেখান আরম্ভ হত এবং ঐ সমস্ত বিষয় শেখা অর্থ কতকগুলি সন-তারিখ, নাম ইত্যাদি মুখস্থ-করা বুঝাত। "জ্ঞানের এই যে অসম্পূর্ণতা, দৃষ্টিভংগীর এই যে অভাব, তার পরিবর্তন দরকার। নইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি নিয়ে, সন্ধানী দৃষ্টিভংগী নিয়ে আমাদের শিশুরা তাদের পরিবেশকে সম্যকরূপে জানতে শিখুক, বুঝতে শিখুক, উপলব্ধি করতে শিখুক, এবং সেই লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক। নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান কতখানি স্থান জুড়ে আছে এবং অলক্ষ্যে তা তাদের জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে—তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তারা আহরণ করুক। তবেই ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।"

এ আদর্শ অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরে ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কোন পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা নেই। পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ ও পরিচিতির মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধানের সঠিক মনোভাব গঠিত করে জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

"পৃথিবী গোল না চ্যাপ্‌টা, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে—এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারাটা শিশুর পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয়—কিন্তু গ্রামের উত্তর পাড়ায় জেলেদের বসতি, দক্ষিণ পাড়ায় কয়েক ঘর নাপিত আছে, গ্রামের রাস্তার শেষদিকে বামধারে একটা

ভাঙা মন্দির আছে—এই সব তথ্য সংগ্রহ শিশু খুব আনন্দের সঙ্গেই করতে চায়। রথের মেলায় কত লোক জড় হয়—কত রকম খেলনা, খাবার আসে, ইত্যাদি বিষয়ে শিশু আগ্রহান্বিত হয়। এই সব বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর ভূগোলের প্রথম জ্ঞান দেওয়া হবে এবং ধীরে ধীরে তাকে কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে বার করতে উৎসাহিত করা হবে।”

“মাতৃভাষা শিক্ষার সময়ই নানারূপ গল্পচ্ছলে শিশুর বাচনভঙ্গী বৃদ্ধি করার সংগে সংগে ভূগোলের জ্ঞান দিতে হবে।”

শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্রদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন—ভ্রমণের কালে শিশুরা যা দেখল তার ছবি আঁকবে। শিশুরা শ্রেণী-কক্ষের, বিদ্যালয়ের, বিদ্যালয়ে আসার পথের নক্সা আঁকবে। নিজেদের পরিবেশের মধ্যে পাখীর বাসা, নানারকম পোকামাকড়, ফল, ফুল, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করবে। ধান, পাট, নানারকম শাকশব্জী কখন, কীরকম জমিতে আবাদ হয়, কখন পাকে, কখন কাটে ইত্যাদি শিশু লক্ষ্য করবে। শিক্ষক মহাশয় এ সকল সম্বন্ধে আলোচনা করবেন এবং এ সকল হতে কীভাবে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত হয় বুঝিয়ে দেবেন। শিশু লক্ষ্য করবে কোন্ ঋতুতে, কোন্ গাছে, কতদিনে কী ফুল বা ফল হয়। এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে কীভাবে যাওয়া যায়, গ্রাম হতে সহরে কীভাবে লোকজন যায় ইত্যাদি আলোচনায় শিশুকে যানবাহন সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যায়।—এভাবে পরিবেশ-পরিচিতির মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান শেখান আরম্ভ করা যেতে পারে।

প্রারম্ভিক স্তরে ঐতিহাসিক কাহিনী বলা যেতে পারে। “গল্প

বলার সংগে সংগে অভিনয় করা, ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করা, কল্পনা-রাজ্যে প্রবেশ করে নিজেকে অতীতের লোকদের সংগে এক করে ফেলা, এই অভিজ্ঞতাগুলি ইতিহাস শেখার পর্যায়ে পড়ে।"

"প্রকৃতি পাঠের জন্য শব্জী ও ফুলের বাগান প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। বিদ্যালয়ের জমির খানিকটা অংশকে ছোট ছোট ক্ষেত্রে বিভক্ত করে সেগুলিকে চাষের উপযুক্ত করে তৈরী করে দিয়ে তাতে ছেলে-মেয়েদের বীজ বপন করতে যদি দেওয়া হয় এবং এক একটি দলকে এক একটি ক্ষেত্রে চাষ করার জন্য যদি দেওয়া হয়, তবে বাগানের কাজের ভেতর দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ জন্মাবে—নিজের ভূমিটিকে ফুলফলে সুন্দর করে তুলতেই যে হবে তাকে। উপরন্তু অঙ্কুরোদ্গম, শিশু উদ্ভিদের বৃদ্ধি তাপ, জল ও মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তা পরীক্ষা করতে পারবে এবং উদ্ভিদের 'শত্রু ও বন্ধুদের' সংগে পরিচিত হতে পারবে।"

"অত্যন্ত স্বাভাবিক আগ্রহের সংগে শিশুরা আবহাওয়ার পরিবর্তন ও সেই সংগে ঋতু পর্যবেক্ষণ করবে; কারণ আবহাওয়ার দ্বারা তাদের খেলাধূলা ও অন্যান্য কাজ প্রভাবান্বিত হয়। * * * সকালে সূর্য আকাশের কোন্ স্থানে অবস্থান করে, কখনই বা মাথার উপর আসে আবার কখনই বা হেলে পড়ে, ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিমাপ, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, নক্ষত্রভরা আকাশ, কোন্দিন ঝড় হ'ল, কোন্দিন বৃষ্টি হ'ল —এসব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী শিশুরা ছবি এঁকে বা কথায় লিখে প্রতিদিন লিপিবদ্ধ ক'রতে পারে।"

"হাট-বাজার বা মেলায় শিশুদের মাঝে মাঝে নিয়ে গেলে তারা পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে, বেচা-কেনা সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন তো

করবেই, উপরন্তু কি কি শাকশব্জী, জীবজন্তু বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে, তা দেখবার সুযোগ পাবে। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামের বা পল্লীর মানুষ, তাদের বিচিত্র পোষাক ইত্যাদি দেখবার অবকাশও মিলবে।"

হাট-বাজারে বেচা-কেনা দেখে শিশু আর একটি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করতে পারে। তা এই যে, সব গ্রাম বা সহরের মানুষই জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরনির্ভরশীল। সুতরাং, সুস্থ জীবন যাপনের জন্য পাশাপাশি গ্রামের বা সহরের লোকের ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতির শান্তিতে ও বন্ধুত্বে বাস দরকার। সভ্যতা মানে দেওয়া-নেওয়া এবং তার জন্য দরকার পরস্পরের সম্প্রীতি।

॥ স্বাস্থ্য-শিক্ষা ॥

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে ভয়াবহ অজ্ঞতা বিরাজমান এবং এই অজ্ঞতার ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের মান অতি নৈরাশ্যজনক। আমাদের গড়পড়তা আয়ু অত্যন্ত কম এবং শিশু-মৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদের দেশের ভাবীপুরুষ আজ যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র, তাদের স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। সুতরাং এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক।

"বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকেরা ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে আসবেন তাদের ৫।৬ বৎসর বয়সের সময় থেকে। এত দেরীতে শিশুদের সংস্পর্শে আসার দরুন তাঁদের কাজ কিছুটা জটিল হয়ে

পড়বে তাতে সন্দেহ নাই। কারণ অশিক্ষিত মা-বাপের কাছ থেকে ছেলেরা তো সাধারণত স্বাস্থ্যশিক্ষা পেতেই পারে না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে বহু অস্বাস্থ্যকর কু-অভ্যাস ঐ ৫।৬ বৎসর বয়সের মধ্যেই তারা গঠন করে। তবুও নিষ্ঠা এবং উৎসাহের সংগে কাজ করে গেলে সুফল পাওয়া যাবে সন্দেহ নাই।"

স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবহারিক ও অভ্যাসমূলক হতে হবে—শুধু বক্তৃতা বা উপদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষক নিজে নিষ্ঠাসহকারে পালন করবেন ও ছাত্রেরা স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় নির্দেশাদি পালন করে কিনা তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

শিশুর স্বাস্থ্যবিধি পালন বিষয়ে শিক্ষক ও শিশুর পিতামাতার সংগে সহযোগিতা স্থাপন আবশ্যক ও শিক্ষক মাঝে মাঝে গ্রামবাসিগণের সহযোগিতায় গ্রাম-সাফাই ইত্যাদি কার্য করবেন এবং ছাত্রেরা সেকাজে যোগ দেবে।

পরিচ্ছন্নতা (ব্যক্তিগত ও সামাজিক) স্বাস্থ্যবিধির গোড়ার কথা। তাই শিশুর স্বাস্থ্যশিক্ষা আরম্ভ হবে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা দিয়ে। উপদেশ দিয়ে এ শিক্ষা হয় না—হাতে-নাতে করে দেখাতে হবে। "শিশুদের মাথা, চুল, চোখ, কান, নাক, দাঁত, জিভ, হাত, পা ও নখ পরিষ্কার আছে কিনা দেখতে হবে। দরকার হলে—এবং প্রথম প্রথম দরকার হবেই—শিক্ষক নিজেই শিশুর দাঁত মেজে, চোখ-মুখ ধুইয়ে, চুল আঁচড়িয়ে, হাত-পায়ের নখ কেটে, হাত-পা ভাল করে রগড়ে ধুয়ে এবং নাক-কান পরিষ্কার করে দেবেন। ছ-চারদিন এভাবে করলেই শিশুদের নিজেদের ও তাদের অভিভাবকদের মনে

একটা স্বাস্থ্য-চেতনা জাগবে এবং তাহলে এর পরে স্বাস্থ্যনীতিগুলি মোটামুটিভাবে পালিত হবে বলে আশা করা যেতে পারে।"

শিশুদের সকালে ওঠার অভ্যাস, সকালে উঠে মলমূত্রত্যাগের অভ্যাস, নিয়মিত উপযুক্ত পরিমাণে শারীরিক ব্যায়ামের অভ্যাস, ঠিকভাবে বসা, দাঁড়ান ও চলার অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে উপযুক্ত পরিমাণ নিদ্রা ও বিশ্রামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যরক্ষায় উপযুক্ত পরিমাণ নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা শিশুদিগকে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিশুরা মুখ বুজে, কাৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোবে।

উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ ও পরিচ্ছন্নভাবে খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন ও গ্রহণের গুরুত্ব শিশুদিগকে বুঝিয়ে দিতে হবে। "খাবার পূর্বে ও পরে ভাল করে হাত-মুখ ধোওয়া প্রয়োজন এবং খাবার জায়গাটি ভাল করে পরিষ্কার রাখা দরকার। শিশুদের ধীরে ও সুস্থ ভাবে খাদ্যদ্রব্য ভাল করে চিবিয়ে খেতে শেখাতে হবে। * * যতদূর সম্ভব প্রত্যহ একই সময়ে খাওয়া উচিত। লোভের বশে অতিরিক্ত খাওয়া অনিষ্টকর ঃ তাড়াহুড়া করে খেলে সে খাবার ভাল হজম হয় না ; এ সকল বিষয় শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।"

পোষাকের প্রয়োজনীয়তা শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ও কর্মক্ষমতা অটুট রাখতে কাজের মতই বিশ্রামও প্রয়োজনীয়—এ জ্ঞান শিশুকে দিতে হবে।

উপরোক্ত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুনো জানা ও মানার সংগে সংগে শিশুদের বিদ্যালয়ের পরিবেশও স্বাস্থ্যপ্রদ করে তুলতে হবে। বিদ্যালয়-গৃহে উপযুক্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বিদ্যালয়ে মলমূত্র ত্যাগের উপযুক্ত নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-চর্চা ও খোলা জায়গায় খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকবে। শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য যথেষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ছাত্রদের দৈহিক উচ্চতা ও সংখ্যা অনুসারে নির্মিত হবে। বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য এমন ভাবে সময় নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে ছাত্রগণ একঘেয়েমি বা অবসাদ বোধ না করে এবং খেলাধূলার জন্যও যথেষ্ট সময় পৃথক করে রাখতে হবে।

দেহের পুষ্টির জন্য (বিশেষত শিশুদেহের) কী জাতীয় খাদ্য, কী পরিমাণ আবশ্যক এবং ঋতুভেদে খাদ্য-পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা শিশুদিগকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সচরাচর সুলভ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যমূল্য এবং ভিটামিন ও বিভিন্ন প্রকার লবণ প্রভৃতি গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানদান করা আবশ্যক। রোগীর পথ্য ও পথ্যাদি প্রস্তুতিকালে অবলম্বনীয় সতর্কতা সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে অবহিত করতে হবে।

গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়াদি সম্বন্ধে শিশুদিগের জানা দরকার। গ্রামের জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, পানীয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত জলের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা, গ্রামের বাসগৃহ কীরকম জায়গায়, কীভাবে নির্মিত হওয়া উচিত, মলমূত্র ত্যাগের উপযুক্ত ব্যবস্থা, আবর্জনাদি নিকাশের ব্যবস্থা, গ্রামের পথঘাটের পরিচ্ছন্নতা, সাধারণ সংক্রামক ব্যাধিগুলোর কারণ, সংক্রমণ-প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা, গ্রামের মেলা বা অন্যান্য কারণে জনসমাগম হলে কী কী সাবধানতা অবলম্বনীয়—এ সকল বিষয় শিশুরা জানবে।

কতগুনো সাধারণ রোগ—তাদের কারণ ও সহজ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিশুদের জানা দরকার। এ সকল রোগের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, অপরিষ্কার দাঁত-জনিত বিভিন্ন রোগ, মাথায় উকুনের উৎপাত, চোখ বা কান দিয়ে জলপড়া, বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ, বিষাক্ত ঘা ও ফোঁড়া, পেটের অসুখ, আমাশয়, বমি ও নানাপ্রকার জ্বর উল্লেখযোগ্য।

মশা, মাছি ও নানাপ্রকার পোকামাকড়, ছারপোকা, ইঁদুর প্রভৃতির অপকারিতা এবং বাড়ীর কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মোরগ প্রভৃতি হতে যে সব রোগ ছড়ায়, সেসব সম্বন্ধেও শিশুরা জানবে।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় রক্তপাত হলে, হাড় ভাঙলে বা মচকালে অথবা বিষাক্ত কোন প্রকার কীট-দংশন বা সর্পাঘাতে ও পাগলা কুকুর কামড়ালে কী কী প্রাথমিক সাহায্য (First aid) করা উচিত, বিভিন্ন প্রকারের 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা, বা রুগ্ন ব্যক্তিকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষক ছাত্রদিগকে হাতে-নাতে শেখাবেন।

শিক্ষক গ্রাম্য সমাজে নানা প্রয়োজনীয় খবরও পৌছিয়ে দেবেন। তিনি স্বাস্থ্য-বিভাগের ও চিকিৎসা-বিভাগের কোথায় কী প্রতিষ্ঠান আছে, সে সম্বন্ধে নিজে জানবেন ও গ্রামবাসীদিগকে জানাবেন যাতে তারা ঐ সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

॥ চারুশিল্প ঃ হস্তশিল্প ॥

সংগীত ঃ "শিল্পের মধ্যে ললিত তথা চারুকলার স্থানই হল প্রধান। চারুকলার প্রকাশ চিত্র, ভাস্কর্য ও সঙ্গীত দিয়ে পরিপূর্ণ।

এ তিনের ভাব-সৌন্দর্যের তুলনা নাই। কিন্তু তাহলেও শিল্পবিদ্‌রা সঙ্গীতকেই শ্রেষ্ঠ কলা বলেছেন। * * সঙ্গীত বলতে বুঝায় গীত, বাদ্য ও নৃত্য। ঐ তিনের সমন্বয় অর্থাৎ আদর্শ সঙ্গীত হবে গান, বাজনা ও নাচের একত্র সমাবেশ। * * মানব-শিক্ষার সৃষ্টি হতে বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারেও সঙ্গীত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।" তাই নূতন শিশুশিক্ষা-ব্যবস্থায় সংগীতকে এক বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে যে সকল সংগীত শেখান হবে, সেগুনোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

(১) জাতীয় সংগীত ঃ জাতীয় সংগীত শুদ্ধ ভাবে গাইতে সকল শিশুকে শিখাতে হবে।

(২) সরল লোক-সংগীত

(৩) ভজন বা ধর্মসংগীত

(৪) কর্মসংগীত (Action Song)

এর প্রত্যেক জাতীয় সংগীতের নমুনা স্বরলিপিসহ "শিক্ষণ-ব্যবহারিকা"য় দেওয়া আছে (পৃঃ ১৫০—২০২)।

"সংগীত শিক্ষায় সকলের চাইতে বড় লক্ষ্য হল, শিশুর আনুভূতিক বিকাশকে সাহায্য করা।"

সংগীত শিক্ষার সময় একসংগে ২৫।৩০ মিনিটের বেশি হওয়া উচিত নয়। প্রথমে শিক্ষক সম্পূর্ণ গানটি একবার ছাত্রদিগকে শোনাবেন। তারপর শিক্ষক একছত্র গাইবেন—ছাত্ররা তাঁর সংগে সংগে গান করবে। শিশুদের সংগীতের তালরক্ষার জন্য ১, ২, ৩, বলে আরম্ভ করতে হবে এবং গানের সংগে সংগে শিক্ষকের অনুকরণে হাতে তালি দিয়ে তারা তাল রাখতে শিখবে।

সংগীত-শিক্ষক নিজে যদি সুগায়ক না হন, তা হলে তিনি স্থানীয় কোন সুগায়কের সাহায্য নেবেন। শিশুদের সামনে কখনই সংগীতের অপকৃষ্ট নমুনা ধরা যাবে না।

ছাত্রগণ কয়েকটি সরল অথচ সুবিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করতে শিখবে। শিশুদের উপযুক্ত নাটক অভিনয়ে ও লোক-নৃত্যচর্চায় উৎসাহী করতে হবে।

অংকন ও চিত্রকলা ঃ অন্যান্য সমস্ত সৃজনাত্মক কাজের মত অংকন ও চিত্রকলার জন্য পরিবেশই মুখ্য। উপযুক্ত পরিবেশে শিশুকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেওয়ার অর্থ অযাচিত উপদেশ-নির্দেশাদি না দেওয়া।

ছাত্রদিগকে প্রথমে বালুর বা 'শ্লেট'-এর উপর আঁকতে দেওয়া যেতে পারে। নানারকম রং ও রং-মেশান সম্বন্ধে তাদের কিছু উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে তাদের চেনা গাছপালা বা জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকতে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

বিশেষ উপলক্ষে গৃহসজ্জা ইত্যাদির জন্য নানারকম আলপনা-আঁকার রীতি গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। শিশুরা সেই রকম আলপনা-আঁকা অভ্যাস করতে পারে।

বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ঘর-বাড়ী, বিদ্যালয়গৃহ প্রভৃতি ফুল-পাতা ও নানা রঙীন জিনিস দিয়ে সাজান শিশুর সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে গণ্য ও এতে সে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে এবং এতে তার সৌন্দর্য-জ্ঞান ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে। সুতরাং এসকল কাজে ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

হস্তশিল্প ঃ হস্তশিল্প মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা আজ সর্বজনানুমোদিত।

কিন্তু আমাদের দেশে আজও শিক্ষা-ব্যবস্থায় হস্তশিল্পের যথাযথ গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি। আশা করা যায়, নবপ্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ক্রমশ এর গুরুত্ব যথেষ্টভাবে স্বীকৃত হবে এবং হস্তশিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান লাভ করবে।

বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পেষ্টালট্‌সি সর্বপ্রথম শিশুর মানসিক বিকাশের সাহায্যের জন্য শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। ফ্রোয়েবেল হাত ও চোখের ব্যবহারের দক্ষতা লাভের জন্য কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে হস্তশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশের বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক কোন হস্তশিল্পকে ভিত্তি করেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

সর্বত্র একই শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নয়। কোথায় কোন্ শিল্প শিক্ষা দিতে হবে, তা স্থানীয় অবস্থা, কাঁচা মালের সুলভতা ইত্যাদি কতগুনো বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

সাধারণত হাতের কাজের মধ্যে সূতাকাটা, কাপড়-বোনা, কাগজ তৈরী, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, মাটির কাজ বা স্থানীয় কোন কুটীর-শিল্পকে শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান দেওয়া যায়।

"প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় হাতের কাজ বলে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন, শিশুর স্বাভাবিক পরিপুষ্টি, তার দৈহিক সামর্থ্য, তার আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাতের কাজে শুধু হাতের নয়, তার মধ্যে সমগ্র দেহ ও মনের ক্রমবৃদ্ধির যাতে সুযোগ থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে

হবে। কাজের মধ্যে যদি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং শিশু যদি নিজে সেই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়, তবে তা তার চিন্তাশক্তির বিকাশের সহায়তা করবে।”

কাজের মধ্য দিয়ে নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য ও যৌথ দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুণের সম্যক বিকাশ হয়। তা ছাড়া, হাতের কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দিলে যে শুধু একটি প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা হয় তা নয়—ছাত্রের মানসিক বিকাশের পথও অনেকখানি প্রশস্ত হয়।

॥ শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা ॥

“শিশুর শরীর গঠনের জন্য সুখাদ্যের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যায়ামের। ব্যায়াম বলতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষম পরিচালনা বুঝায়। মানব-দেহের মাংসপেশীগুলির যথোচিত বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য তাদের পরিচালনা একান্ত দরকার। কোন মাংসপেশী যদি সঞ্চালিত না হয়, তার পুষ্টি ও বিকাশ ঘটে না। আবার কোনটির অধিক সঞ্চালন ঘটলে তার অপরিমিত পুষ্টি শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সুতরাং ব্যায়াম বলতে প্রতি অঙ্গের সুষম সঞ্চালন বুঝায়। এই সুষম সঞ্চালনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে এবং শিশুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নিজেদের চলা-ফেরার মধ্যে এই ছন্দোময় অঙ্গসঞ্চালন-ক্রিয়ায় আসক্ত থাকে।”

“এই স্বাভাবিক ছন্দকে অব্যাহত রেখে শিশুদের জন্য এমন কোন ব্যায়াম-কৌশল নির্বাচিত করতে হবে যা শিশু-প্রবৃত্তির পরিপূরক হবে, তার পক্ষে ভার-স্বরূপ হবে না।”

"খেলাধূলা ও অঙ্গচালনার নির্বাচন ও পরিবেশ এমন হবে যেন দৈহিক পুষ্টি ও বিকাশের সংগে সংগে শিশুর শক্তি, সাহস ও কর্মক্ষমতা বাড়ে, তার শারীরিক গঠনভঙ্গী সুন্দর ও সুঠাম হয়, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষিপ্রতা জন্মায় ও জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায় ; এর সংগে তার সামাজিক কর্তব্যবোধ, সহযোগিতামূলক মনোভাব, দেশাত্মবোধ, নেতৃত্ব-ক্ষমতা, জয়-পরাজয়ে খেলোয়াড় জনোচিত অনুত্তেজিত মনোভাব, আত্মসম্ভ্রমবোধ ও সাধুতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণগুলির বিকাশসাধনের দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে হবে। * * তা ছাড়া আট থেকে দশ বৎসরের শিশুদের জন্য এমন কতগুলি খেলা ব্যবস্থা করা চলে যাতে শিশুর দৈহিক ব্যায়ামের সংগে সংগে শ্রবণক্ষমতা, আচরণ করবার ক্ষমতা ও অনুকরণ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যথা—

(ক) শিকার করার অনুরূপ খেলা—দৌড়ান, পশ্চাদ্ধাবন, বন্দীকরা, পলায়ন।

(খ) নিক্ষেপ করা ও ধরা, কোনও বস্তু একদলের নিকট হ'তে অপরে লুফে নেবে—"রুমাল-চুরির" মত খেলার ব্যবস্থা রাখা যায়।

(গ) বিভিন্ন জীবজন্তুর চালচলনের অনুকরণমূলক ব্যায়াম।

(ঘ) দৌড়-ঝাঁপ সংযুক্ত খেলাধূলা।

'ড্রিল' এই বয়সের ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত নয়, কারণ ড্রিলের মধ্যে আনন্দ, কল্পনাশক্তি, অনুকরণ ও অভিনয়শক্তির সার্থকতা ঘটে না ও শিশুকে অত্যধিক শৃঙ্খলায় ভারাক্রান্ত করে।"

দলবদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক খেলার দোষগুণ দুই-ই আছে। এতে দশে মিলে, দশের গৌরবের জন্য কাজ করার মনোভাব ও

অভ্যাস হয়, শিশুরা দলকে ব্যক্তির উর্ধ্বে ভাবতে শেখে। অপর-পক্ষে, এ জাতীয় খেলায় প্রতিযোগিতা অবাঞ্ছনীয় রূপ গ্রহণ করতে পারে, দলের স্বার্থের জন্য ন্যায় ও সত্য অবহেলিত হতে পারে। তাই এ জাতীয় খেলা প্রবর্তন ও পরিচালনায় এবং দল গঠনে সতর্কতা প্রয়োজন।

শিবির স্থাপন, বেড়াতে যাওয়া, মেলা, মজলিস প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারাও শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

॥ ডল্টন প্ল্যান (Dalton Plan) ॥

শ্রেণীবদ্ধভাবে পাঠদানে মেধাবী ছাত্রদের পাঠের অগ্রগতি ব্যাহত হয়ঃ অপর দিকে, অল্প-মেধাবী ছাত্র শ্রেণীর সংগে এক তালে অগ্রসর হতে পারে না। শ্রেণীগত পাঠদানের এ অসুবিধা দূর করে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি যথাপ্রয়োজন মনোযোগ দেবার উদ্দেশ্যে মিস্ হেলেন পার্কহার্ষ্ট "ডল্টন প্ল্যান" নামে এক শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আমেরিকায় ডল্টন নামক এক স্থানে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম এ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। সে স্থানের নাম অনুসারেই এ পদ্ধতির নামকরণ হয়।

ছাত্রগণকে এক এক শ্রেণী হিসাবে দলবদ্ধ করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক ছাত্রদিগকে একত্রিত করে নির্দিষ্ট বিষয়ে তারা কী শিক্ষালাভ করবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন ও নির্দেশাদি দেন, কিন্তু শ্রেণীগতভাবে পাঠদান করেন না। ছত্রাগণকে এক সংগে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সাধারণত এক মাস) কাজ (Assignment) ঠিক করে দেওয়া হয় এবং ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় তা শিখতে বলা হয়।

এক এক বিষয়ের জন্য এক একটি ঘর নির্দিষ্ট থাকে। সেখানে নির্দিষ্ট বিষয়ের পুস্তক, ছবি, 'চার্ট' ইত্যাদি সাজান থাকে। বিদ্যালয়ে কোন সময়-পত্রিকা (Time table) থাকে না। ছাত্রগণ শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনায় জিজ্ঞাস্য সব কিছু জেনে নেয়। সময়-পত্রিকা না থাকলেও দিনের সময়কে দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়—প্রথম-ভাগে প্রধান প্রধান বিষয়ের 'assignment'-এর কাজ করতে হয়।

ছাত্রগণ যখন যে বিষয় শিক্ষা করার ইচ্ছা করে বা প্রয়োজন বোধ করে তখন সেই বিষয়ের শিক্ষকের ঘরে গিয়ে যতক্ষণ খুশী সে বিষয় আলোচনা করতে বা পড়তে পারে। ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয় পড়ে তার সারমর্ম লেখে। শিক্ষক তা পরীক্ষা করে প্রতিটি ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির রেখাচিত্র (Graph) প্রস্তুত করেন। এ ছাড়া "ডল্টন প্ল্যান"-এ অন্য কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই।

এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, ছাত্রগণ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অগ্রসর হবার সুযোগ পায়, তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং ফলে তাদের আত্মনির্ভরশীলতা শেখা হয় ও দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে। একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এ ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর ছাত্রকে বিশেষ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন।

তবে ইহা নিম্নশ্রেণীর উপযোগী নয় এবং ইহা সকল বিষয় শিক্ষার সমান উপযোগী নয়। এ ব্যবস্থায় ছাত্রের উপর অত্যধিক দায়িত্ব স্থাপন করা হয় এবং মেধাবী ছাত্রেরাই এর উপকার লাভ করতে পারে। কমবুদ্ধি ছাত্রের পক্ষে ইহা তেমন উপযুক্ত নয়। তবে শ্রেণীপাঠনার অনুপূরকভাবে এর ব্যবহার করলে ছাত্রগণ এ পদ্ধতি দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারে।

বিভিন্ন ছাত্রের পাঠে অগ্রগতির তাল বিভিন্ন, এ সম্বন্ধে শিক্ষক অবহিত হয়ে এ পদ্ধতির মৌলিক নীতি সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকলে শ্রেণীগত পাঠনার অসুবিধা বহু পরিমাণে দূর করতে পারেন।

॥ কার্য-সমস্যা পদ্ধতি (Project Method) ॥

স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কার্যরূপ সমস্যা সমাধানের আকারে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে কার্য-সমস্যা পদ্ধতি (Project Method) বলে। এ পদ্ধতিতে একটা সমস্যা ছাত্রের সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং ছাত্র নিজ চেষ্টায় সে সমস্যা সমাধান করে।

সমস্যা দুই প্রকার হতে পারে—(ক) বুদ্ধিমূলক ও (খ) কার্য-মূলক। বুদ্ধিমূলক সমস্যা সমাধানে কোন কাজ করতে হয় না—সমাধানের কল্পিত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারলেই সমস্যাটির সমাধান হয়। কার্যমূলক সমস্যা সমাধানে ছাত্রকে হাতে কলমে কাজটি করতে হয়।

এই পদ্ধতিতে ছাত্রদিগকে চারিটি স্তরে কাজ শেষ করতে হয়।

(ক) কাজের জন্য কয়েকজন মিলে দল করা ঃ

(খ) কাজের পরিকল্পনা করা ঃ

(গ) কাজ সম্পাদন করা ঃ এবং (ঘ) কাজের বিচার করা।

এ পদ্ধতিতে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা হয় বলে শিক্ষা সমধিক কার্যকরী হয়, ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাবার সুযোগ হয় ও শিক্ষার সংগে বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে থাকায় ছাত্রগণ অধিক আগ্রহের সংগে শিক্ষালাভ করে এবং এতে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়।

একথা স্বীকার্য যে, এ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা কঠিন; কারণ এ পদ্ধতি অবলম্বনে বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক জ্ঞানদান সম্ভব নয়। তবে, "ডল্টন প্ল্যান"-এর ন্যায়, শ্রেণীগত পাঠনার অনুপূরক হিসাবে এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে বর্তমান কিতাবী শিক্ষার অনেক দোষত্রুটী শোধরান যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে ছাত্রগণ ছোট ছোট কার্যসমস্যা সমাধান করতে পারে। তবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে কার্য সম্পাদন করতে ছাত্রগণকে বাইরেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

বৎসরের প্রথমেই বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করার কালে কতকগুলি কার্য-সমস্যার আকারে এক এক বিষয়ের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করে নেওয়া সুবিধাজনক।

॥ পরিকল্পনার নমুনা ॥

সাপ্তাহিক পরিকল্পনা

তৃতীয় শ্রেণী

প্রধান শিল্পকাজ ঃ কাতাই (তূলা ধোনা, পাঁজ তৈরী ও সূতাকাটা)

উদ্দেশ্য ঃ শিশুরা বর্তমান সপ্তাহে তাদের শ্রেণীতে প্রত্যেকে গড়ে আধ ফেটী সূতাকাটার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উপকরণাদি ঃ যুদ্ধপিঞ্জন, পাঁজপিড়ি, পাঁজকাঠি, তকলী ও চরখা।

সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা ঃ

৩ দিন আধঘণ্টা করে তকলীতে সূতা কাটবে।
৩ দিন ৪৫ মিনিট করে পাঁজ তৈরী করবে।
৩ দিন ৪৫ মিনিট করে চরখায় সূতা কাটবে।

সম্পর্কিত বিষয় সমূহ ঃ

(ক) গণিত ঃ শিশুদের ব্যক্তিগত কাজের অগ্রগতির লেখ (graph) প্রসংগে সরলরেখা দ্বারা পরিমাপ নির্ণয়-কৌশল শিখবে। প্রত্যেকদিনের কাজের শেষে গড়ে দৈনিক উৎপাদন নির্ণয়-প্রসংগে গড়-নির্ণয় শিখবে।

(খ) পরিবেশ পরিচিতি ঃ তুলার বিভিন্ন ধরন—তুলা গাছ ও ফল সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা।

একথা স্বীকার্য যে, এ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা কঠিন; কারণ এ পদ্ধতি অবলম্বনে বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক জ্ঞানদান সম্ভব নয়। তবে, "ডল্টন প্ল্যান"-এর ন্যায়, শ্রেণীগত পাঠনার অনুপূরক হিসাবে এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে বর্তমান কিতাবী শিক্ষার অনেক দোষত্রুটী শোধরান যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে ছাত্রগণ ছোট ছোট কার্যসমস্যা সমাধান করতে পারে। তবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে কার্য সম্পাদন করতে ছাত্রগণকে বাইরেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

বৎসরের প্রথমেই বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করার কালে কতকগুলি কার্য-সমস্যার আকারে এক এক বিষয়ের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করে নেওয়া সুবিধাজনক।

॥ পরিকল্পনার নমুনা ॥

সাপ্তাহিক পরিকল্পনা

তৃতীয় শ্রেণী

প্রধান শিল্পকাজ : কাতাই (তূলা ধোনা, পাঁজ তৈরী ও সূতাকাটা)

উদ্দেশ্য : শিশুরা বর্তমান সপ্তাহে তাদের শ্রেণীতে প্রত্যেকে গড়ে আধ ফেটী সূতাকাটার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উপকরণাদি : যুদ্ধপিঞ্জন, পাঁজপিড়ি, পাঁজকাঠি, তকলী ও চরখা।

সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা :

৩ দিন আধঘণ্টা করে তকলীতে সূতা কাটবে।

৩ দিন ৪৫ মিনিট করে পাঁজ তৈরী করবে।

৩ দিন ৪৫ মিনিট করে চরখায় সূতা কাটবে।

সম্পর্কিত বিষয় সমূহ :

(ক) গণিত : শিশুদের ব্যক্তিগত কাজের অগ্রগতির লেখ (graph) প্রসংগে সরলরেখা দ্বারা পরিমাপ নির্ণয়-কৌশল শিখবে।

প্রত্যেকদিনের কাজের শেষে গড়ে জনপিছু উৎপাদন নির্ণয়-প্রসংগে গড়-নির্ণয় শিখবে।

(খ) **পরিবেশ পরিচিতি :** তূলার বিভিন্ন ধরন—তূলা গাছ ও ফল সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা।

শিল্পীদের কথা ঃ গ্রামের কুটিরশিল্প ও গ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য।
হাট ও মেলার কথা ঃ গ্রামের আমদানী-রপ্তানী ব্যবস্থা।
(গ) **সাহিত্য ঃ** কৃষিকর্ম (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।
হাট (কবিতা) (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
কাজের বিবরণী রচনা ঃ
গ্রামের কুটিরশিল্প সম্বন্ধে রচনা লেখা ঃ
অন্যান্য আনুষংগিক কাজ ঃ শিশুরা একদিন গ্রামের শিল্পীদের সংগে পরিচিত হতে গ্রামে যাবে।
(পরিকল্পিত ভ্রমণ) ঃ
বিদ্যালয়ের তূলাক্ষেত থেকে তূলা তোলা ঃ
সাফাইর কাজ ঃ ২ দিন ছবি আঁকা, ২ দিন খেলা।
'ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা' গানটি অভ্যাস করানো হবে।

দৈনিক পরিকল্পনা (১২, ২, ৫৯)

সময়	কাজ
১০-৩০ মিঃ থেকে ১১ টা	সাফাই, বাগান পরিচর্যা ও শ্রেণী-প্রস্তুতি।
১১টা থেকে ১১-১৫ মিঃ	সমবেত সংগীত, খবর বলা, তারিখ ও আবহাওয়া-সংবাদ লেখা।
১১-১৫ মিঃ থেকে ১২ টা	কাতাই।
১২টা থেকে ১২-৩৫ মিঃ	সূতার পরিমাণ লেখ ও গড় নির্ণয় এবং ঐ প্রসংগে অনুরূপ সহজ গড়ের অংক শেখান।

১২-৩৫ মিঃ থেকে ১টা	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য :— রচনা লেখা : বিষয়—কুটির-শিল্প।
১টা থেকে ১-৩০ মিঃ	বিশ্রাম।
১-৩০ মিঃ থেকে ২টা	ভূগোল :—গ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট ও মেলার কথা।
২টা থেকে ২-৪০ মিঃ	গ্রামের শিল্পীদের সংগে পরিচিত হবার জন্য শিশুদের ভ্রমণ-পরিকল্পনা।
২-৪০ মিঃ থেকে ৩-৪০মিঃ	ভ্রমণ।
৩-৪০মিঃ থেকে ৪টা	ছাত্রদের নিকট থেকে প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ ও ছুটি।

সময় :	শ্রেণীর কাজ :	উপকরণাদি :	শ্রেণী পরিচালন পরিকল্পনা :
১০-৩০মিঃ থেকে ১১	সাফাই, বাগান পরিচর্যা, শ্রেণী-প্রস্তুতি	সাফাইর যন্ত্রপাতি, বাগান চর্যার যন্ত্রপাতি, শ্রেণী-প্রস্তুতির উপকরণ।	শিশুরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে নির্বাচিত নেতার অধীনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কাজগুলো করবে। শিক্ষক সংগে থাকবেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দেবেন।

সময় ঃ	শ্রেণীর কাজ ঃ	উপকরণাদি	শ্রেণীর পরিচালন পরিকল্পনা
১১টা থেঃ ১১-১৫মিঃ	সমবেত সংগীত, খবর বলা, তারিখ পাল্টানো ও আবহাওয়া সংবাদ লেখা	খবরের কাগজ, আবহাওয়া বোর্ড, দেয়াল পঞ্জী।	শিশুরা মিলিত কণ্ঠে "সবারে বাসরে ভাল" গানটি গাইবে। আবহাওয়া নেতা গতকালের আবহাওয়ার বিবরণ জানাবে—আবহাওয়া-বোর্ড-এ তা লেখা হবে। তারপর সংবাদ আহ্বান করা হবে। শিক্ষক খবরের কাগজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো পড়ে শোনাবেন। খবর বোর্ড-এ লেখা হবে।
১১-১৫মিঃ থেকে ১২টা	চরখায় সূতাকাটা	কাতাই সরঞ্জাম-সমূহ।	পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মোট কত সূতা কাটা হয়েছে হিসাব করে, আজ কোন্ প্রক্রিয়ায় সূতাকাটা হবে তা শিশুরা নির্ধারণ করবে। চরখায় সূতা-কাটায় উদ্বুদ্ধ করে, কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে শিশু-দিগকে কাতাইর সরঞ্জাম দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রত্যেকে সূতা গুটিয়ে ফেলবে ও পরিমাণ লিখে রাখবে।

সময়ঃ	শ্রেণীর কাজঃ	উপকরণাদিঃ	শ্রেণীর পরিচালন-পরিকল্পনা
১২টা থেকে ১২-৩৫মিঃ	গণিতঃ পরিমাণ লেখ ও গড় নির্ণয়	শিশুদের প্রত্যেকের পরিমাণ পরিমাণ লেখ (Line graph)	শিশুরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিমাণ লেখ ব্যক্তিগত অগ্রগতি-রেখা ও তারিখ দ্বারা চিহ্নিত করবে। তারপর নিম্নলিখিত ভাবে গড়ের অংকের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবেঃ ক কেটেছে ৩৫ তারঃ খ কেটেছে ৩৯ তারঃ দুজনে কেটেছে ৩৫ + ৩৯ = ৭৪ তার। যদি দুজনে সমান কাটত তবে প্রত্যেকে কাটত ৭৪/২ = ৩৭ তার। সুতরাং দুজনের গড় ৩৭ তার। অনুরূপভাবে ৩ জন, ৪ জন ও ৫ জনের গড় বুঝিয়ে এ সূত্রটি শিশুদের অনুধাবন করাতে হবে যে গড়= মোট পরিমাণ ÷ মোট সংখ্যা। শিশুদের আজকার সূতাকাটার গড় নির্ণয়ে সাহায্য করা হবে। তারপর নিম্নলিখিত ধরণের গড়ের অংক কষতে দেওয়া হবেঃ

সময় :	শ্রেণীর কাজ :	উপকরণাদি :	শ্রেণীর পরিচালন-পরিকল্পনা
			একটি শ্রেণীতে সোমবার ১৮ জন, মংগলবার ২৭ জন, বুধবার ২৯ জন, বৃহস্পতিবার ২৫ জন, শুক্রবার ২৬ জন ও শনিবার ২৫ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল। ছাত্রের দৈনিক উপস্থিতির গড় কত ?
১২-৩৫ মিঃ থেকে ১টা	সাহিত্য : রচনা ; কুটির-শিল্প	বোর্ড, চক, ডাষ্টার (Duster)	শিশুরা পরিবেশ-পরিচিতি উপলক্ষে কুটির-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। আজ কুটির-শিল্প সম্বন্ধে তারা রচনা লিখবে। লেখার আগে, কুটির-শিল্প কাকে বলে, ঐ শিল্প সাধারণত গ্রামে হয় কেন, কুটির-শিল্পের সুবিধা কী—ইত্যাদি আলোচনা করা হবে। লেখার শেষে খাতাগুলো সংশোধনের জন্য সংগ্রহ করা হবে।
১টা থেকে ১-৩০ মিঃ	বিশ্রাম :		খেলাধূলা ও 'টিফিন'-খাওয়া

সময় :	শ্রেণীর কাজ : উপকরণাদি :	শ্রেণীর পরিচালন-পরিকল্পনা
১-৩০মিঃ থেকে ২টা	ভূগোল : গ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য : হাট ও মেলার কথা	শিশুদের প্রশ্ন করা হবে : তাঁতী যে কাপড় বোনে তা সে কী করে? তাঁতী কী বাড়ী বাড়ী ঘুরে তার কাপড় বিক্রী করে? যে গ্রামে তাঁতী নেই, সে গ্রামের লোক কাপড় কী ভাবে পায়? এ সকল প্রশ্নদ্বারা শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করে, তাকে বুঝতে সাহায্য করা হবে যে গ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য কী ভাবে চলে—হাট ও মেলায় কী ভাবে বাণিজ্য চলে।
২টা থেকে ২-৪০মিঃ	ভ্রমণ-পরিকল্পনা রচনা	গ্রামের শিল্পীদের সংগে পরিচিতির জন্য শিশুরা গ্রামে যাবে। তারা একটি প্রশ্নমালা তৈরী করবে। শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন। প্রশ্নের নমুনা :— ১। শিল্পীর নাম কী? ২। তিনি কী শিল্পে রত? ৩। সে শিল্পে কী কী কাঁচা মাল লাগে? ৪। কী কী যন্ত্রপাতি লাগে?

সময় :	শ্রেণীর কাজ :	উপকরণাদি :	শ্রেণীর পরিচালন-পরিকল্পনা
			৫। কোথা থেকে কাঁচা মাল কেনেন ? ৬। কোথা থেকে যন্ত্রপাতি কেনেন ? ৭। তৈরী মাল কোথায় বিক্রী করেন ? ৮। তাঁর শিল্পের জন্য অন্য কোন্ কোন্ শিল্পের সহায়তা লাগে ?—ইত্যাদি
২-৪০ মিঃ থেকে ৩-৪০ মিঃ	ভ্রমণ		তারপর ছাত্রেরা শিক্ষকের সংগে গ্রামে যাবে। প্রশ্নোত্তর সংগ্রহের জন্য বাজারে ও শিল্পীদের বাড়ীতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছাত্রেরা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে ছাত্রেরা স্কুলে ফিরবে ও হাত-পা ধুয়ে শ্রেণীতে বসবে।
৩-৪০ মিঃ থেকে ৪টা	প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ ও ছুটি		ছাত্রদের নিকট থেকে প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ করা হবে। তারপর ছুটি হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক কাজের শেষে শিক্ষক **মন্তব্য** লিখবেন যে কাজ পরিকল্পনা অনুসারে সম্পাদিত হল কিনা। কোন কাজ সম্পাদিত না হলে কেন হল না, সে বিষয়ে মন্তব্য লিখবেন।

বুদ্ধ পূর্ণিমা-উৎসব অবলম্বনে চতুর্থ শ্রেণীতে সম্পর্কিত (Co-related) শিক্ষাদানের পরিকল্পনা

প্রস্তুতি ঃ ১। শিশুরা উৎসব পালনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি লাভ করবে। মানসিক প্রস্তুতি উৎসবের অন্তত দশদিন আগে হবে।

২। পরিকল্পনা রচনা।

৩। প্রদর্শনী সজ্জা, পত্রিকা রচনা, নাট্যালেখ্য রচনা, অভিনয়ের জন্য সাজসজ্জা তৈরী বা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দলগঠন।

৪। কাজের অগ্রগতির সম্বন্ধে সাধারণ সভায় বা শ্রেণীতে আলোচনা।

উপস্থাপন ঃ অনুষ্ঠানের দিন বিভিন্ন দল নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। প্রধান মন্ত্রী শিক্ষক মশাইর পরিচালনায় বিভিন্ন দলের কাজের সংযোগসাধন ও ভুল-ত্রুটী সংশোধন করবে।

বিচার ঃ অনুষ্ঠানের পর প্রতি দল নিজ নিজ কাজের বিবরণী রচনা করবে।

সাধারণ সভায় বা শ্রেণীতে দলের বিবরণী পাঠ ও আলোচনা হবে।

আলোচনা উপলক্ষে যে যে বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ শিশুদের মনে জেগেছিল, সে সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রস্তুতি ও বিচার-স্তরে সম্পর্কিত শিক্ষাদানের সুযোগ সমধিক। এ ক্ষেত্রে প্রস্তুতি-স্তরে ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য এবং বিচার-স্তরে গণিত ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঠদানের সুযোগ আছে।

চতুর্থ শ্রেণী

বিষয় ঃ ইতিহাস

বিশেষ পাঠ ঃ বুদ্ধদেবের বাল্যজীবন

সময় ঃ ৪৫ মিনিট।

উপকরণাদি ঃ বুদ্ধদেবের চিত্র ঃ ভারতবর্ষের মানচিত্র ঃ ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের সীমা ও কপিলাবস্তুর অবস্থান-চিহ্নিত বিশেষভাবে অংকিত মানচিত্র।

প্রশ্নের সাহায্যে শিশুদের মনে পাঠে আগ্রহসৃষ্টিঃ (প্রস্তুতি)

১। এখন কী মাস ? আজ কত তারিখ ?

২। আজ কী তিথি ? পূর্ণিমার কত দিন বাকী ?

৩। বৈশাখী পূর্ণিমায় কোন্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন ?

৪। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তোমরা কিছু বলতে পার কী ? (এ প্রশ্নের সাহায্যে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা হবে।)

বিদ্যালয়ে পরিকল্পিত বুদ্ধ-পূর্ণিমা উৎসব পালনের অংগ হিসাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (প্রদর্শনী, পত্রিকা রচনা, অভিনয় ইত্যাদি) সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য বুদ্ধদেব সম্বন্ধে জানা দরকার। তা বুঝতে সুযোগ দিয়ে শিশুদের আজকার বিশেষ পাঠে আগ্রহী করা হবে।

উপস্থাপন ঃ শিশুদের সহজবোধ্য ভাষায়, গল্পের মত করে বুদ্ধদেবের আগেকার কালে সমাজে ধর্মের নামে যাগযজ্ঞ, পশুবলি ইত্যাদির প্রচলন, কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের সন্তানহীনতা, বহু কামনার পর পুত্রলাভ, বুদ্ধদেবের বাল্য ও কৈশোরের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর গৃহত্যাগের কাহিনী বলা হবে।

স্থান ও কাল সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা দেবার জন্য মানচিত্র ও সময়-লেখ দেখান হবে। পাঠকে সরস করার জন্য ছোট ছোট প্রাসংগিক প্রশ্ন করা যেতে পারে।

তারপর শিশুদিগকে পাঠটি নীরব পঠনের জন্য সময় দেওয়া হবে।

প্রয়োগ ঃ লব্ধজ্ঞান দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রয়োগমূলক প্রশ্ন শিশুদিগকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

১। রাজা শুদ্ধোদন কত বছর আগে পুত্রলাভ করেন ?

২। তিনি তাঁর পুত্রের কী নাম রেখেছিলেন ?

৩। সিদ্ধার্থের কোন্ কোন্ আচরণ অন্য শিশুদের তুলনায় অস্বাভাবিক ছিল ?

৪। সিদ্ধার্থের সংসার-বৈরাগ্য হল কেন ?—ইত্যাদি (এই পাঠের পর সাহিত্য-শ্রেণীতে সিদ্ধার্থ ও দেবদত্ত শীর্ষক কবিতা বা গল্প পড়লে উভয় পাঠই মনোহর হবে এবং বিষয়ের সংগে বিষয়ের সম্পর্কিত পাঠের দৃষ্টান্ত হবে।

দুই-তিন পাঠে শিশুরা বুদ্ধদেবের সমগ্র কাহিনী শিখলে, পত্রিকার জন্য তাদের লেখা আহ্বান করলে, তারা বাড়ীতে এ বিষয় অধিকতর পাঠে উৎসাহী হবে।)

কার্য-সমস্যা পদ্ধতিতে পাঠদান পরিকল্পনা

পঞ্চম শ্রেণী

সমস্যা ঃ শিশুরা তাদের বাগানে বসবার বেঞ্চের অভাব অনুভব করে।

কর্মপরিকল্পনা ঃ শিশুরা শ্রেণীতে সমস্যাটি ও তার সমাধানের কথা আলোচনা করে ঃ বিভিন্ন ধরনের বেঞ্চ তৈরীর কথা আলোচনা করে ইট আর সিমেন্ট দিয়ে বেঞ্চ তৈরীর প্রস্তাব গ্রহণ করে।

পরিকল্পনা গ্রহণ ঃ শিশুরা মাপ-জরিপ করে ৪খানা বেঞ্চ তৈরীতে কত ইট দরকার নির্ণয় করবে।

কতখানি সিমেন্ট দরকার জেনে তার মূল্য নির্ণয় করবে।

তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবে এবং স্থানীয় রাজমিস্ত্রীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করবে।

কাজটিকে বিভিন্ন ইউনিট-এ ভাগ করে তদনুসারে বিভিন্ন দল গঠন করবে।

মাঝে মাঝে কাজের অগ্রগতি পরিমাপ করা হবে ও অগ্রগতি-লেখ রাখা হবে।

কাজের শেষে বিভিন্ন দলের বিবরণী শ্রেণীতে আলোচিত হবে।

গৃহাদি নির্মাণ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে যে আগ্রহ জেগেছে, তার প্রেরণায় ভারতের অতীত ও বর্তমান বাস্তুশিল্পের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে জানা প্রসংগে ইতিহাস ও ভূগোল ও কাজের হিসাবাদি প্রসংগে গণিত শেখার প্রয়োগ হবে।

[এইরূপ Project-এ ইট-তৈরীর পরিকল্পনাও নেওয়া যায় তবে, তাতে Project দীর্ঘায়িত হয়।]

পঞ্চম শ্রেণীতে গণিতের সম্পর্কিত পাঠের নমুনা—

পঞ্চম শ্রেণী

বিষয় ঃ গণিত

বিশেষ পাঠ ঃ ক্ষেত্রফল-সংক্রান্ত হিসাব

প্রস্তুতি ঃ ছাত্রেরা বেঞ্চ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কত ইট দরকার হবে তা নির্ণয় করতে হবে।

ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ

১। ক'খানা বেঞ্চ তৈরী হবে?

২। বেঞ্চগুনো কতটা লম্বা ও কতটা চওড়া হবে?

৩। বেঞ্চ কতটা উঁচু হবে, তলায় ভিত্তি কতটা থাকবে?

৪। প্রতি বেঞ্চের জন্য তলায় ক'খানা ইট লাগবে?

৫। একখানা ইটের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কত?
(মেপে দেখা হবে।)

৬। প্রতি বেঞ্চে ক'খানা ইট লাগবে?

উপস্থাপন ঃ শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় এ বাস্তব অংকটি বোর্ড-এ করবেন।

তিনি অনুরূপ আরও দু'একটি অংক বোর্ড-এ করবেন। যথা— শ্রেণীর টেবিলের মত লম্বা, চওড়া ও উঁচু একখানা ইটের টেবিলের জন্য ক'খানা ইট লাগবে?

প্রয়োগ ঃ শিক্ষকমশাই সহজ থেকে কঠিন এই পর্যায়ে কতগুলো অংক শিশুদিগকে কষতে দেবেন।

প্রশ্নের নমুনা ঃ ১। ১৫′ × ১০′ এক মেঝেয় বিছানোর জন্য ১০″ × ৫″ কতখানা ইট দরকার ?

১। একটি ৩′ × ৩′ × ১′৬″ বেদীর জন্য ৯″ × ৬″ × ৩″ কতখানা ইট লাগবে ?